মন-দেয়া-নেয়া :

শ্রীবুদ্ধদেব বসু

এম. সি. সরকার এণ্ড সন্স্
১৪ কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা

মন-দেওয়া-নেওয়া

Sri Kumud Nath Dutta

14C, KALI KUMAR BANERJEE LANE

TALA, CALCUTTA-2.

শ্রীপ্রেমেন্দ্র মিত্রকে
দিলাম

এই উপন্যাস ১৯৩০-এর নবেম্বর-ডিসেম্বর মাসে লেখা।

প্রথম পরিচ্ছেদ

'নাঃ, কল্‌কাতায় আর টেঁকা যায় না।' দ্বিজেন সিতাংশুর কথার জের টেনে বল্‌তে লাগ্‌লো, 'ভদ্রশ্রেণীর যে যেখানে ছিলো, সব অদৃশ্য হয়েছে; শহর মেড়ো আর উড়ে আর মাদ্রাজী আর হোয়াট্‌-নট্‌-এ ছেয়ে গেছে। তবু ভাগ্যিস,' দ্বিজেন একটু আশ্বাসের স্বরে কথাটা শেষ কর্‌লো, 'তবু ভাগ্যিস ট্র্যাম-বাস্‌-এর কন্‌সেশ্‌ন্‌ আজকেই শেষ।'

'কিন্তু এ-ক'দিনে কল্‌কাতায় ভালো-চেহারার মেয়ের সংখ্যা আশ্চর্য্য-রকম বেড়ে গিয়েছে। দশজনের মধ্যে একজন মেয়েই প্রায় সুন্দর—আশ্চর্য্য! মফঃস্বল থেকে সব এসেছে আর কি—মুখ দেখেই খোলা হাওয়া আর খাঁটি দুধ আঁচ করা যায়। কিন্তু সব,' সিতাংশু মুখের একটা বিশ্রী ভঙ্গী কর্‌লে, 'সব মেয়ে খদ্দর-পরা। খদ্দর—!' সিতাংশুর কাঁধ-ঝাঁকুনি বাকি কথা ব্যক্ত কর্‌লে, 'The country is going to the dogs'.

'The country', ঈশান সিতাংশুর কথার প্রতিধ্বনি করে' বল্‌লে, 'is going to the dogs' এই ছ্যাখো না, ইডেন গার্ডেনের সবগুলো বেঞ্চি এক জায়গায় জড়ো করা—জাজ্বল্যমান ইলেক্‌ট্রিসিটির মধ্যে। না-হয় গাছের নীচে খুব কাব্যি করে' সাজানো। এদিকে গাছ-গুলো সব পাখীদের আড্ডা; কে যে কখন দয়া করে' তোমার মাথায় বা পিঠে পুরীষোৎসর্গ করে, সেই ভয়ে কবিত্ব যায় শুকিয়ে কাঠ হ'য়ে। Scandalous! কেন রে বাপু, কেনালের আশেপাশে খান-কয়েক বেঞ্চি রাখ্‌লে কি গঙ্গার সব জল লাফিয়ে ডাঙায় উঠে' আস্‌তো?

তা হ'লেই তো আমাদেরকে রাজার আইন অমান্য করে' এই নৌকোয় এসে বস্‌তে হ'তো না। সত্যি বল্‌তে কী, এ-দেশে বাস কর্‌তে হ'লে criminal না হ'য়ে উপায় নেই। দেশটা দিন-কে-দিন গোল্লায় যাচ্ছে একেবারে।'

দ্বিজেন বল্‌লে, 'এ-বিষয়ে স্‌টেট্‌স্‌ম্যান্‌-এ একটা চিঠি লিখে' দেখ্‌তে পারো।'

'এই, তোমরা সবাই ইজাডোরা ডান্‌কান্‌-এর বইখানা পড়েছো নিশ্চয়ই?'

ইন্দ্রজিতের এই আকস্মিক ও অসংলগ্ন প্রশ্ন শুনে' ওরা তিনজনে একসঙ্গে হেসে উঠ্‌লো। সিতাংশু বল্‌লো, 'এতক্ষণ চুপ করে' থেকে কী ভাব্‌ছিলে তুমি?'

কী ভাব্‌ছিলো, ইন্দ্রজিত সে-কথা ফাঁস কর্‌তে প্রস্তুত নয়। তবে, ওদের কথার এক বর্ণও যে তা'র কানে ঢুক্‌ছিলো না, তা ঠিক; এতক্ষণ প্যাগোডার এক প্রহরী বুদ্ধের দিকে বুদ্ধের মতই ভাবহীন, স্থবির মুখ করে' সে তাকিয়ে ছিলো। ইন্দ্রজিত স্বভাবতই কথা খুব কম বলে; ওকে কোনো প্রশ্ন জিজ্ঞেস কর্‌লে ও অবিশ্যি ওর সাধ্যমত তা'র জবাব দেবে—কিন্তু নিজে কোনো প্রসঙ্গ-উত্থাপন করা কি কোনো সাধারণ আলোচনায় যোগ দে'য়া ওকে দিয়ে বড় হ'য়ে ওঠে না; তা'র মানে, ও চুপ করে' থাক্‌তেই ভালোবাসে। সিতাংশু একদিন ওর সঙ্গে বাস্‌-এ ভবানীপুর থেকে শ্যামবাজার যেতে-যেতে একটা এক্‌স্‌পেরিমেণ্ট করেছিলো; বৌবাজারের মোড় পর্য্যন্ত সিতাংশু ইচ্ছে করে'—অর্থাৎ, নিজের ইচ্ছার বিরুদ্ধে—চুপ করে' রইলো; দেখি, ইন্দ্রজিত প্রথমে

কথা বলে কিনা। কিন্তু ইন্দ্রজিত বুদ্ধের মত স্থবির মুখ করে' বসে' আছে তো বসে'ই আছে। শেষটায় সিতাংশুর নিজেরি অসহ্য হ'য়ে উঠ্‌লো; বল্‌লো, 'এই, তুমি রবিঠাকুরের আঁকা ছবি দেখেছো তো?'

'বাঃ—কে না দেখেছে!' মজা এই, ইন্দ্রজিত কথাটা একেবারে লুফে' নিলে, কথা বল্‌তে পেয়ে যেন বেঁচে গেলো। আসলে কিন্তু, চুপ করে' থাক্‌তে ওর একটুও আপত্তি নেই; তবে কথাটা নিতান্তই যখন উঠে' পড়েছে, খানিকক্ষণ না-হয় চল্‌লোই, এই ওর ভাব। সিতাংশু যদি ওখানেই চুপ করে' যেতো, তা হ'লে ইন্দ্রজিত আর-কোনো কথা বল্‌তো কিনা, সন্দেহ। কিন্তু চুপ করে' থাক্‌বার ছেলে সিতাংশু নয়; কাজেই, বাকি রাস্তা রবীন্দ্রনাথের চিত্র-চর্চ্চা সম্বন্ধে ওরা যে-রসালো আলাপ করলে, তা এখানে লিপিবদ্ধ কর্‌লাম না—পাছে বড়-চুল-ওলারা কেউ মর্ম্মাহত হন।

তাই, গেলো আধ ঘণ্টা ধরে' ইন্দ্রজিতের ছেদহীন নীরবতা ওরা কেউ গায়ে মাখে নি। কথা বল্‌তে ইন্দ্রজিতের অনিচ্ছা (বা অক্ষমতা—যা-ই হোক্) ওর বন্ধুরা মেনে নিয়েছে, এ নিয়ে আর তা'র সঙ্গে ওদের ঝগ্‌ড়া নেই। কিন্তু নিজে না বল্‌লেও বন্ধুদের কথাবার্ত্তা ও শোনে—বেশ মন দিয়েই শোনে। তা-ই ওর অভ্যেস। সেই জন্যই, ওদের দেশ-হিতৈষণার মাঝখানে ইন্দ্রজিত যখন হঠাৎ কথা কয়ে' উঠ্‌লো, তখন বন্ধুরা প্রথমটায় রীতিমত অবাকই হ'লো। হ'লো, কারণ: (১) ইন্দ্রজিত গায়ে পড়ে' কোনো কথা বল্‌লে; (২) ওরা বুঝ্‌তে পার্‌লো, ইন্দ্রজিত এতক্ষণ ওদের কথা কিছুই শুন্‌ছিলো না; সম্ভবত, নিজের মনে কোনো বিষয়ে ভাবতে-ভাব্‌তে ইজাডোরা ডান্‌কান্‌-এ এসে

ঠেকেছিলো। আবার, পরের মুহূর্ত্তেই বিস্ময় কেটে গিয়ে ওদের পেলো হাসি; পাবারই কথা। কেননা, ১৯৩০ সনের শেষের দিকে কী করে' কোনো ভদ্রলোক ইস্নাডোরার বই নিয়ে আলাপ করতে পারে—যে-প্রসঙ্গ অ্যাদ্দিনে পুরোনো কাঁথার মত পুরোনো হ'য়ে গেছে? তা ছাড়া, ওরা যখন ভীষণভাবে প্রমাণ করতে লেগেছে যে দেশটা একেবারে উচ্ছন্নে যাচ্ছে, তখন হঠাৎ—! তা'র ওপর, ইন্দ্রজিতের মুখে এই প্রশ্ন, best-sellerদের প্রতি যা'র মনোভাব খানিক করুণার সঙ্গে অনেকটা বিদ্রূপে মেশানো!—হাসি পাবারই কথা।

হাসি শেষ হ'লে পর দ্বিজেন বল্লে, 'পড়েছি বই কি;—কে-ই বা না পড়েছে। বছর খানেক আগে কল্‌কাতার সবাই ও-বই পড়্‌ছিলো।'

'কেমন বই?'

'বেশ বই,' সিতাংশু বল্লে, 'খাসা বই, বেড়ে বই।' তুমি একটা drivelling idiot বলে'ই ওটা অ্যাদ্দিনেও পড়ো নি। যে-লোক কবিতা ছাড়া আর-কিছু পড়্‌তে পারে না, বিংশ শতাব্দীতে এসে জন্ম নে'য়া তা'র পক্ষে চূড়ান্ত বোকামি।'

ইন্দ্রজিত শেষের কথাটার মৃদু প্রতিবাদ করে' বল্লে, 'উপন্যাস-টুপন্যাস আমি একেরারেই যে পড়্‌তে পারি নে, তা নয়। এড্‌গার ওয়ালেস্-এর ছত্রিশখানা বই আমি পড়েছি।' একটু থেমে ইন্দ্রজিত একটা ভবিষ্যৎ-বাণী করলে: 'আরো পড়্‌বো।'

'তা পড়্‌বে না! আমার মনে হয় কী, জানো, ইন্দ্রজিত; কালে তুমিই বোধ-হয় পৃথিবীর একমাত্র লোক হ'বে, যে এড্‌গার ওয়ালেস্-এর

সব বই প'ড়েছে। ভেবে দেখ্‌তে গেলে, এমি জন্‌সন্‌-এর কীর্ত্তির চাইতে এটাও কিছু কম কৃতিত্ব নয় : পঞ্চম জর্জ্জ জান্‌তে পেলে হয়-তো তোমাকে একটা প্রাইজ-ট্রাইজ কিছু দিয়ে দেবেন। কিন্তু সত্যি—' ঈশান গলার স্বর বদ্‌লে জিজ্ঞেস কর্‌লে, 'ইজাডোরার বই পড়্‌তে চাও তুমি? তা এ-বই যে-কোনো স্কুলগার্ল্‌-এর কাছে পাবে—একদিন নিয়ে পড়্‌লেই তো পারো।'

'বইখানা,' ইন্দ্রজিত বল্‌লে, 'আমার আছে।'

তিন বন্ধু আকাশ থেকে পড়্‌লো একেবারে। 'তোমার আছে!' সিতাংশু বলে' উঠ্‌লো, 'গ্‌অড্‌! কবে কিন্‌লে?'

'এই তো, সেদিন।'

'পড়ো নি?'

'পাতা উল্টিয়ে দেখেছি।—ছবিগুলো কিন্তু বেশ।'

'ছবিগুলো!' দ্বিজেন হঠাৎ উঠে' দাঁড়ানোয় সমস্ত নৌকো দুলে' উঠ্‌লো। 'You doddering ass, তুমি পনেরো শিলিং দিয়ে ছবি-ওলা বই কিন্‌তে গেলে কেন? এ-বইয়ের পেছনে সাড়ে-সাত শিলিং খরচ করাই যথেষ্ট। হ'তে ষোলো বছরের সবে-তুর্গেনিয়েফ-পড়া ছেলে, তবু না-হয় বুঝ্‌তাম; কিন্তু তুমি—তুমি ইন্দ্রজিত সেন, যা'র বয়েস পঁচিশ হ'তে চল্‌লো, যে এ-পর্য্যন্ত কম-সে-কম এক ডজন মেয়ে-লোক ঘেঁটেছে, যা'র কবিতার বইয়ের নাম "দীপালি"ও নয়, "চৈতালি"ও নয়, পষ্টাপষ্টি "প্রেমের কবিতা", সেই তুমি ও-বই কিন্‌তে গেলে কেন?'

ইন্দ্রজিত চুপ করে' রইলো।

সিতাংশু আর ঈশান একসঙ্গে ইন্দ্রজিতকে চেপে ধর্‌লো: 'কেন?

কেন ? বলো ; বল্‌তে তোমাকে হ'বেই। জবাব না দে'য়া অবধি তোমাকে ছাড়্‌ছি নে।'

কিন্তু ইন্দ্রজিত যে চুপ সে চুপ।

ঈশানের হঠাৎ মনে পড়্‌লো। দেশলাইয়ের জলন্ত কাঠিটা থালের জলে ফেলে' দিয়ে সে বল্‌লে, 'ও।' তারপর সিগ্রেটে আর-এক টান দিয়ে: 'বইখানা কাউকে দেবার জন্যে কিনেছো ?'

সিতাংশু ঈশানের কথাটা লুফে' নিলে: 'মিস্ দত্তকে ?'

দ্বিজেন বল্‌লো, 'কোন্— ? ও, তোমার সেই ইষ্টিমারে আলাপিতা ইস্কুল-মাষ্টারনী ?'

'ও, তা-ই।' ঈশান মীমাংসা কর্‌লে।

'গোড়াতেই কথাটা সোজাসুজি বল্‌লেই তো পার্‌তে।' ইন্দ্রজিতের কাঁধে এক ঝাঁকুনি দিয়ে সিতাংশু বল্‌লে: 'মিস্ দত্তকে দেবার জন্য তুমি একখানা ইজাডোরা ডান্‌কান্ কিনেছো—এই সামান্য কথাটা বা'র কর্‌তে আমরা তিনজনে ঘায়েল হ'য়ে গেলাম।' সিতাংশু হেসে উঠ্‌লো। 'দাও তো, ঈশান, একটা সিগ্রেট। তুমি খাবে একটা, ইন্দ্রজিত ?'

'না।' নীরবতার সমুদ্র থেকে একবার মুহূর্তের জন্য মাথা তুলে'ই ইন্দ্রজিত আবার টুপ্‌ করে' ডুবে' গেলো। বই উপহার-দে'য়া—কী silly ব্যাপার! সে, ইন্দ্রজিত সেন, সে-ও তা কর্‌ছে। কিন্তু উপায় কী—যা'র সঙ্গে যেমন। সুলতা বই পেয়ে খুসি হ'বে—বিশেষ, এ-বই। সুলতা আবার আর্টের উপাসক কিনা। ইষ্টিমারে প্রথম দশ মিনিট আলাপ করে'ই সে মেয়েটির ধাত বুঝতে পেরেছিলো। আশ্চর্য্য, তা'র

কপালে এসে সব জোটেও! যেখানে-সেখানে মেয়েরা তা'র জন্য ওৎ পেতে বসে' আছে; নিশ্চিন্তে একটা journey কর্‌বারো উপায় নেই—অ্যাক্‌সিডেণ্ট্ ঘট্‌বেই। এবার ঘট্‌লেন মিস্ সুলতা দত্ত। যাচ্ছিলো বোনকে রেখে আস্‌তে ঢাকায়; কিছুর মধ্যে কিছু নয়, হঠাৎ এলো বিপদ। ইন্দ্রজিতের সঙ্গে গ্রহ-নক্ষত্রদেরই আড়াআড়ি আছে—ও যেখানেই যাক্, যত সাবধানেই চলুক্,ওর পথে মেয়েলোক এনে ফেল্‌বেই। ভোরবেলা গোয়ালন্দ থেকে ইষ্টিমার ছাড়্‌বার পর ও বোনকে চা খেতে ডাকৃতে গিয়ে ছাখে, সে পার্শ্বোপবিষ্টা এক যুবতীর সঙ্গে বিষম গল্প জুড়ে' দিয়েছে। অমঙ্গল-আশঙ্কায় ইন্দ্রজিতের মুখ কালো হ'য়ে উঠ্‌লো, কিন্তু তখন আর পালাবার সময় নেই। আলাপ হ'লো। ভাবানীপুরের এক মেয়ে-ইস্কুলের মিস্‌ট্রেস; ইন্দ্রজিত সেনের নাম ঢের শুনেছে, এবং কবিতা পড়েছে। (এমন কি, পরে, কথায়-কথায় ইন্দ্রজিতের দু'লাইন কবিতা quoteও করেছিলো—মানে, misquote করেছিলো।) ইন্দ্রজিতের বোনের সঙ্গে আলাপ কয়েক মিনিটের—যদিও দেখে তা সন্দেহ করে কা'র সাধ্যি। বাঙালী জাতের মধ্যে একেবারেই reserve নেই বলে'ই তো আমরা কাঁঠালের কোয়ার মত ঢিলে,থল্‌থলে প্যাচ্‌পেচে হ'য়ে যাচ্ছি,—পথে-ঘাটে, বলা নেই, কওয়া নেই, যা'কে-তা'কে ধরে' আলাপ কর্‌লেই হ'লো। যত সব—! তা বাপু নিজে আলাপ কর্‌ছিস্ কর্—কেউ তো বাধা দিচ্ছে না; কিন্তু বাপ-দাদা চোদ্দ পুরুষের পরিচয় দে'য়ার কী দরকার? আবার আহ্লাদে আটখানা হ'য়ে বলা হয়, 'দাদা, ওঁর সঙ্গে তোমার আলাপ করিয়ে দিই'—যেন দাদার হাতে আকাশের চাঁদ এনে গুঁজে' দিলেন। 'Such a pleasure to meet you.'

মেয়েদের কাছে এলেই ইন্দ্রজিতের ভাবহীন, স্থবির মুখে এক আশ্চর্য্য হাসি ফুটে' ওঠে ; চাপা অথচ তীক্ষ্ণ, গভীর ইঙ্গিতে ভরা ; ক্ষণস্থায়ী, কিন্তু হৃদয়-বিদারক। অনেক অভ্যেসের ফলে এমন হয়েছে যে কোনো মেয়ের কাছে এলে নিজের অজান্তেই ইন্দ্রজিতের মুখে সে-হাসি ফুটে ওঠে—সে হাস্‌তে না চাইলেও, তা'র মনের অবস্থা হাসির ঠিক প্রতিকূল হ'লেও। যেমন, এ-ক্ষেত্রে। ইন্দ্রজিতের মন নিমের মত তেতো হ'য়ে যাচ্ছিলো ; তবু সে তা'র মেয়ে-মার্কা হাসি হেসে জবাব দিলে, 'Not so much as mine'। বলে'ই আত্ম-ধিক্কারে তা'র সারা গা রি-রি করে' উঠ্‌লো। এবার আর তা'র রক্ষে নেই। সে গেছে।

চা খাবার সময় দুই সদ্য-আলাপিতা যুবতীর অজস্র বাক্‌চালনা থেকে আত্মরক্ষা কর্‌বার জন্য সে পকেট থেকে বা'র কর্‌লে ছোট একখানা চাম্‌ড়ার ব্রাউনিঙ্‌—কে জানে, স্টীমারের উৎকৃষ্ট চা আর পদ্মার হাওয়ার সহযোগে কতগুলো জায়গা সে বুঝে'ও ফেল্‌তে পারে। মাথা নীচু করে' চল্‌লো তা'র একটু-একটু করে' চা-খাওয়া আর কবিতা-পড়া—সে-টেবিলে আর যা'রা বসে' আছে, ইন্দ্রজিতের পক্ষে তা'দের অস্তিত্ব নেই। তা'র মেজাজ একটু-একটু করে' ভালো হ'য়ে উঠছিলোও (পদ্মার হাওয়া সত্যি চমৎকার), কিন্তু হঠাৎ স্বলতার কাছ থেকে এলো ছন্দপতন : 'কী পড়্‌ছেন ?'

বই থেকে চোখ না তুলে' ইন্দ্রজিত জবাব দিলে, 'Red Cotton Night-Cap Country'।

'ফেইরি টেইল বুঝি ? কা'র লেখা ?' স্বলতা একটা রসিকতা কর্‌বার লোভ সাম্‌লাতে পার্‌লো না।

এইবার স্থলতার দিকে তাকিয়ে ইন্দ্রজিত বইয়ের মলাট তা'র দিকে মেলে ধর্‌লো।

'র-বার্ট্‌ ব্রাউ-নিঙ', স্থলতা আস্তে-আস্তে পড়্‌লো, 'ব্রাউনিঙ, ব্রাউনিঙ্‌। ও, হাঁ। আপনি Rabbi Ben Ezra পড়েছেন নিশ্চয়ই?'

'হুঁ।'

'কেমন লাগে আপনার?'

'এই—' ইন্দ্রজিত কথাটা অসমাপ্ত রাখ্‌লো।

কিন্তু নিরুৎসাহিত হ'বার পাত্র স্থলতা নয়। বরং, হঠাৎ সে উচ্ছ্বসিত হ'য়ে উঠ্‌লো 'চমৎকার। জীবনের প্রতি এমন চমৎকার attitude; Reason আর Faith-এর এমন চমৎকার compromise, কল্পনার এমন—এমন—এমন—' স্থলতা কথাটা ছেড়ে দিয়ে সংক্ষেপে বক্তব্য শেষ কর্‌লে, 'Fine!'

স্থলতার প্রত্যেকটি কথা তীক্ষ্ণ শারীরিক যন্ত্রণার মত ইন্দ্রজিতকে আঘাত কর্‌ছিলো। ঈশ্বর, ঈশ্বর—মনে-মনে সে গাঢ় প্রার্থনা কর্‌ছিলো—ঈশ্বর, আমাকে অন্ধ করো, পঙ্গু করো, আমার অকাল-অপমৃত্যু ঘটাও, আমাকে নিয়ে যা খুসি তা-ই করো; কিন্তু মূর্খ অশিক্ষিত নির্ব্বোধ লোকের কাব্যালাপ শোন্‌বার শাস্তি থেকে আমাকে বাঁচাও, আমাকে বাঁচাও।

কিন্তু আশ্চর্য্য এই যে মনে মনে যতক্ষণ সে এই প্রার্থনা কর্‌ছিলো, মুখে ততক্ষণ সে তা'র মিষ্টি মেয়ে-মার্কা হাসি হাস্‌ছিলো; না হেসে পার্‌ছিলো না আর কি—অভ্যেস এম্‌নি জিনিষ। কিন্তু—

ইন্দ্রজিত তা'র প্রত্যেকটি কথায় সায় দিচ্ছে, স্থলতা সে-হাসির এই রকম মানে কর্‌ছিলো। স্থলতার মনে খুসি আর ধর্‌ছিলো না। স্থলতা সাধারণ মেয়ে নয়, স্থলতা আর্টের উপাসক ; আর্ট-বিষয়ক আলাপ কর্‌তে পেলে সে আর-কিছু চায় না।

ইন্দ্রজিত আবার বইয়ের পাতার ওপর চোখ নাবালো। পাৎলা ইণ্ডিয়া পেপারের পাতা কখন যেন উল্টে' গেছে ; ইন্দ্রজিত তা'র পড়া জায়গায় ফিরে' আস্‌বার জন্য পাতা ওল্টাচ্ছে, এমন সময় বোনের তিরস্কার শুন্‌তে পেলো : 'ওটা এখন রেখেই দাও না, দাদা। তুমি যে কত বড় ক্যাড, স্থলতাকে আর তা জানিয়ে দিচ্ছো কেন ?'

উপায় নেই, উপায় নেই—ইন্দ্রজিত মনে-মনে ভাব্‌লো—আমাকে রক্ষে কর্‌বার কেউ নেই, আমাকে পথে বসাতে চায় সবাই। পুরুষ বলে' আমার আত্ম-রক্ষারও কোনো কৌশল নেই। এই পৃথিবীতে, ইন্দ্রজিত মীমাংসা কর্‌লো, এই পৃথিবীতে পুরুষ হ'য়ে জন্মাবার মত বিড়ম্বনা কিছু নেই। বেশ, পালাবার যখন পথ নেই, তখন ভদ্রলোকের মত নিয়তিকেই মেনে নে'য়া যাক্। ক্লান্তভাবে সে বইখানা পকেটে ফিরিয়ে রাখ্‌লো। তারপর চোখ তুলে' স্থলতার দিকে তাকালো—ইচ্ছে করে'ই তাকালো। মেয়েটি দেখ্‌তে বেশ—মানে, মোটের ওপর। কালো, ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, কালো ; ফর্সা মেয়েতে ইন্দ্রজিতের অরুচি ধরে' গেছে। অবিশ্যি খুব কালো নয় ;—যেমন বাঙালীরা সাধারণত হ'য়ে থাকে, সেই রকম। তবে, গায়ের চাম্‌ড়ায় জৌলুষ আছে। পাৎলা, ছোটখাটো মেয়েটি—চলাফেরায়, কথায়, হাসিতে চঞ্চল। Sport, মনে হয়। খুব সজীব মুখ, ফুর্‌ফুরে

পাংলা ঠোঁট, উজ্জ্বল চোখ। সাহস আছে, মনে হয়। মোটের ওপর, বেশ দেখ্‌তে। ইন্দ্রজিত মনকে খুসি করবার চেষ্টা করতে লাগ্‌লো। After all, এমন-কিছু খারাপ নয়। ভালোই, বলা যায়। বলেই না-হয় কবিতা-সম্বন্ধে—তা অনেক ছেলের মুখেও সে এই রকম কথা শুনেছে, আর সুলতা তো মেয়ে; একে মেয়ে—তায় আবার বি-এ পাশ! সুলতা মেয়ে; এবং মেয়ে-হিসেবে ওর মধ্যে প্রশংসার অনেক জিনিষ আছে—যেমন, ওর অ্যাট্রাক্‌টিভ চেহারা। ঐটুকু আকর্ষণের জন্য খানিকক্ষণ না-হয় সাহিত্যচর্চ্চাই শোনা গেলো—এমনি-আর কী আসে যায়!··· ইন্দ্রজিত মনে-মনে সুলতাকে স্বীকার করে' নিলে; ইন্দ্রজিত ধরা দিলে।

সারাটা পথ নানারকম আলাপ হ'লো—বেশির ভাগই সাহিত্য-প্রসঙ্গ। সাহিত্যের ওপর সুলতার বেজায় ঝোঁক। ইংরিজিতে অনার্স্‌ ছিলো। সময় পেলেই বই পড়ে। All Quiet on the Western Front বেরুনোমাত্র পড়েছে—ইন্দ্রজিতের ও-বই কেমন লাগে?

ইন্দ্রজিত বল্‌লে যে বই পড়্‌তে তা'র বিশেষ ভালো লাগে না, এবং যখন পড়ে, কবিতাই পড়ে—আর ডিটেক্‌টিভ উপন্যাস।

হ্যাঁ, কবিতা সুলতারও খুব ভালো লাগে; সব চেয়ে ভালো লাগে, বলা যায়। শেলি আর কীট্‌স্‌ তা'র সব চেয়ে প্রিয়। ইন্দ্রজিতের?

ইন্দ্রজিত জবাব না দিয়ে শুধু হাস্‌লো।

ইন্দ্রজিতের কবিতাও সে পড়েছে, কিন্তু ঠিক বুঝ্‌তে পারে নি। একটু যেন শক্ত। তা ছাড়া, সাধারণ, ঘরোয়া ব্যাপার নিয়ে কি কবিতা হয়? —তাও প্রেমের কবিতা! প্রেমের কবিতা মানে শেলি—'The desire of the star for the moth—'

'—moth for the star', ইন্দ্রজিত শুধরে দিলে, 'যদিও ওতেও এক রকম মানে হয়।'

আর, ইন্দ্রজিত সনেট লেখে কেন? সনেটের কাঠখোট্টা বাঁধা-ধরা আইনে ইমোশন্ আড়ষ্ট হ'য়ে পড়ে—পড়ে না? ইন্দ্রজিতের অন্যান্য কবিতা তা'র বেশ লাগে, যেমন 'ঘুমানো মেয়ে'।—

যে-মেয়ে ঘুমায়ে আছে, কী করে' জাগানো যায় তা'রে—
তোমরা বলিতে পারো কেউ?

স্নলতা কথায়-কথায় ও-কবিতার অনেকখানি আবৃত্তি করলে, কিন্তু এবার আর ইন্দ্রজিত তা'র ভুলগুলো শুধ্রে দিলে না; তা'র বেজায় ক্লান্ত লাগ্ছিলো।

নারাণগঞ্জ এসে স্নলতা বল্লো, 'আমার এখানেই journey's end, স্নতরাং good-bye। মানে, আপাতত। দেখা আবার নিশ্চয়ই হ'বে।'

ইন্দ্রজিত বাহুল্য মনে করে' কোনো কথা বল্লো না।

বোন বল্লে, 'তুমি তো পরশুই ফিরছো, দাদা, স্নলতাও দু'চার-দিনের মধ্যেই ফিরবে, বল্লে। দু'জনে একদিনে গেলেই তো পারো।'

স্নলতা বল্তে গেলে লাফিয়ে উঠ্লো।—'তা বেশ হ'বে। সত্যি বেশ হ'বে। আপনি কি *positively* পরশুই ফিরছেন?'

'এখন পর্য্যন্ত তো সে ব্যবস্থাই আছে।'

'আচ্ছা, আমিই না-হয় ছুটীর দু'-একদিন হাতে রেখেই ফিরবো;—বাড়িতে না বল্লেই চল্বে। এখানে আমার একদিনেরই দরকার। আর, কল্কাতার বাইরে থাকতে পারে মানুষ?'

ইন্দ্রজিত একটু ভেবে সায় দিলে, 'তা-ও বটে।'

'কিন্তু যদি হঠাৎ কোনোরকম গোলমাল হ'য়ে যায়, আপনি জান্‌বেন কী করে'? আপনার ঢাকার ঠিকানাটা—'

ইন্দ্রজিত ঠিকানা দিলে। দিয়ে ফল হ'লো এই যে রওনা হ'বার দিন সকালবেলা সে এক লম্বা চিঠি পেলো। তা'র বক্তব্য বল্‌তে গেলে এই যে যাওয়া সুলতার সেদিনই হ'বে; কিন্তু আনুসঙ্গিক এবং অপ্রাসঙ্গিক অনেক কথা চিঠিতে ছিলো: যেমন, জীবনের দুর্ব্বহ নিঃসঙ্গতা, সকালের আলোয় পদ্মার সৌন্দর্য্য, গল্প-উপন্যাসের ওপর কবিতার শ্রেষ্ঠতা—এই-সব। চিঠি পড়ে' ইন্দ্রজিত দীর্ঘশ্বাস ফেল্‌লো। কিন্তু নিয়তির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করা বৃথা মনে করে' সে চিঠিখানা সযত্নে তা'র এক বইয়ের মধ্যে ঢুকিয়ে রাখ্‌লে। কল্‌কাতায় আসার পর চিঠিশুদ্ধ সেই বই পড়্‌লো ঈশানের হাতে; এবং ফলে, ব্যাপারটা ইন্দ্রজিতের বন্ধু-মহলে জানাজানি হ'য়ে গেলো। অবিশ্যি, এম্‌নিও যে গোপন থাক্‌তো,তা নয়; কারণ, কথা কইতে ভালো না বাস্‌লেও, বন্ধুদের কাছে মেয়েদের সঙ্গে তা'র যোগাযোগের বিবরণ দিয়ে সে অদ্ভুত তৃপ্তি পায়;—ঈশান বলে, মন থেকে বিষ বা'র করে' দিয়ে বাঁচে। ইন্দ্রজিতের সব 'আমুর' ছিলো তা'র বন্ধুদের কাছে অফুরন্ত ঠাট্টার বিষয়। সিতাংশু বলে, ইন্দ্রজিত একসঙ্গে তিনটে প্রেমে পড়ে' পরের দিনই দুটো থেকে বেরিয়ে এসে আবার একটা নতুন প্রেমে পড়ে, তাই ঠিক এই মুহূর্ত্তে তা'র কোন্ প্রেম চল্‌ছে, হিসেব করে'ও বলা কঠিন। ইন্দ্রজিতের এই 'ইষ্টিমারে আলা-পিতা ইস্কুল-মাষ্টারনী'র ব্যাপার ওদের কাছে প্রথম থেকেই ভারি মজার ঠেক্‌ছিলো; আর, বিশেষ, সচিত্র ইজাডোরা ডান্‌কান্ উপহার দে'য়ার

কথা যখন শোনা গেলো, তখন তো কথাই নেই। হাস্‌তে-হাস্‌তে সিতাংশু জিজ্ঞেস কর্‌লে, 'বই কিনে' ঘরে জমিয়ে রাখছো কেন? দিয়ে ফেল্‌লেই তো পারো।'

'আজ দেবো '

'আজ! আজ কখন্?' দ্বিজেন জিজ্ঞেস কর্‌লে।

'রাত্তিরে। ওর ওখানে আবার নেমন্তন্ন আছে কিনা।'

'Good!' সিতাংশু ইন্দ্রজিতের পিঠ চাপ্‌ড়ালে, 'এরি মধ্যে যখন অ্যাদ্দুর এগিয়েছো, তখন শীগ্‌গিরই, আশা করি, ছেড়ে দেবার সময় হ'বে।'

'Good না হাতী!' ইন্দ্রজিত খেঁকিয়ে উঠ্‌লো, 'বেশি রাত্তিরে খাওয়া আমার একেবারেই সয় না। তা'র ওপর, আজ্‌কে আবার পেটের ব্যথাটা বোধ কর্‌ছি বলে' মনে হচ্ছে।'

'তোমার gastric ulcer? ওটা সেরে যায় নি?'

'হোমিওপ্যাথি ওষুধে ঠাণ্ডা ছিলো বটে, কিন্তু খাওয়ার কোনোরকম অনিয়ম হ'লেই আবার চাঙ্গা হ'য়ে ওঠে। বাড়িতে ঠিক diet চলে—শুক্তো, শাদা মাছের ঝোল, একটু দই—তাই একরকম ভালোই থাকি। কিন্তু বাইরে খেলেই অসুখ করে।'

'অথচ মিস্ দত্তর নেমন্তন্ন তো ফেরানোও যায় না।' দ্বিজেন বল্‌লে, 'প্রেম করা কী ল্যাঠা!

সিতাংশু বল্‌লে, 'যাক্ এখন আর কী হ'বে। বেশি কিছু খেয়ো না—আর চাও তো তোমাকে একটা প্রেস্ক্রিপশনও দিতে পারি।'

এতক্ষণে ইন্দ্রজিত একটু হাস্‌লো।—'জানি তোমার প্রেস্কৃপশন। ঈশানের জ্বরের সময় যেটা দিয়েছিলে, সেটাই তো?'

ঈশান বল্‌লে, 'আর দ্বিজেনের যেবার চোখের জন্য মাথা ধর্‌তে লাগলো, তখনো সেই একই প্রেস্কৃপশন।'

তিনজনে একসঙ্গে হেসে উঠ্‌লো। কিন্তু সিতাংশু কিছুমাত্র লজ্জিত না হ'য়ে সে-হাসিতে যোগ দিলে। বল্‌লে, 'সত্যি বল্‌তে কী, এক ফোঁটা বিয়ার তোমার যে কত উপকার করে, তা'র আর ইয়ত্তা নেই। আমার তো যখনি শরীর খারাপ লাগে—তা যে কোনো রকমেরই হোক্—পূরো একটা স্টাউট খেয়ে ফেলি—সব অসুখ যায় সেরে।'

'যেন অসুখ না কর্‌লেই তুমি খাও না।' দ্বিজেন ফস্ করে' বলে' উঠ্‌লো।

'আহা—সেটাও তো স্বাস্থ্যরক্ষার জন্যই খেতে হয়। Nothing like stout to keep one fit—কী বলো, ঈশান?' বলে' সিতাংশু ইন্দ্রজিতের পিঠে এক প্রবল চড় মার্‌লো।

'উঃ!' ইন্দ্রজিত বল্‌লে, 'অমন করে' উৎসাহ প্রকাশ কর্‌তে হয় না। তা ছাড়া, আমি ঈশান নই।'

'না-ই বা হ'লে। তোমার মতটাই শুনি?'

'কোন্ বিষয়ে?'

'এই—এই—এই ইয়ে আর কি—বুঝ্‌লে না? কী না বল্‌ছিলাম হে দ্বিজেন?'

দ্বিজেন বল্‌লে, 'চুলোয় যাক্ তুমি যা বল্‌ছিলে।'

সিতাংশু তৎক্ষণাৎ সায় দিলে, 'যাক্।'

হঠাৎ দ্বিজেন জিজ্ঞেস কর্‌লে, 'আচ্ছা ইন্দ্রজিত, তুমি যে বইখানা না পড়েই ওঁকে দিতে যাচ্ছো, ইজাডোরার সম্বন্ধে কথা উঠ্‌লে—এবং তা উঠ্‌বেই—তো হাঁদার মত চুপ করে' থাক্‌বে। তুমি মনেও ভেবো না যে মিস্ দত্ত এখনো এ-বই পড়েন নি। তুমি বই নিয়ে গেলেই তোমার ওপর সহসা প্রশ্ন নিক্ষিপ্ত হ'বে—আর তখন—'

'তখন,' ঈশান বল্‌লে, 'তখন ও স্রেফ বলে' দেবে যে ও-বই ও পড়ে নি। আর তা'তে মিস্ দত্তর চোখে নেবে-যাওয়া দূরে থাক্, আরো কয়েক ধাপ ওপরে উঠে' যাবে। তা-ই নয়, ইন্দ্রজিত ?'

'তা-ই। আমি যে ডিটেক্‌টিভ উপন্যাস পড়্‌তে ভালোবাসি, এটাও ও জিনিয়াস্-এর একটি লক্ষণ বলে' ধরে' নিয়েছে। আমি সাধারণ উপন্যাস পড়্‌তে পারি নে জেনে ও কী খুসি! শেলিও নাকি কোনোদিন উপন্যাস পড়্‌তো না।

'গ্ অড্।' সিতাংশু এবার মাথায় হাত দিলে—মানে,নিজের মাথায়। '—এই, ইন্দ্রজিত—দ্যাখো, ইজাডোরার কথা উঠ্‌লে তুমি মিস্—মিস্ ইয়েকে একটা গল্প শুনিয়ে দিয়ো—সেই ব্যর্নার্ড শ'র গল্পটা। ঘটনাটা বইয়ে নেই—না থাক্‌বারই কথা। শুনে' মিস্ ওর-নাম-কী খুব impressed হবেন।'

'ব্যর্নার্ড শ'র গল্প ?' ইন্দ্রজিত হঠাৎ শিশুর মত কৌতূহল প্রকাশ কর্‌লে, 'কোন্‌টা ? আমি তো জানি নে।'

'কী-ই বা জানো তুমি!' দ্বিজেন ঠোঁট উল্‌টিয়ে বল্‌লে।

ইন্দ্রজিত লজ্জিতভাবে বল্‌লে, 'সত্যি আমি জানি নে। বলো না, সিতাংশু।'

'শোনো তা হ'লে। ইজাডোরা ডান্‌কান্ একবার ব্যর্নার্ড্ শ'কে লিখে' পাঠান্ : "তোমার intellect আর আমার beauty দিয়ে যদি একজন মানুষ তৈরি হয়, তা হ'লে তা'র জন্যে পৃথিবী আমাদেরকে ধন্যবাদ দেবে।" ব্যর্নার্ড্ শ জবাব দেন্ : "কিন্তু যদি সে-ব্যক্তি আমার beauty আর তোমার intellect নিয়ে আসে?" '

সিতাংশুর কথা শেষ হওয়ামাত্র সবাই হো-হো করে' হেসে উঠ্‌লো—এমন কি, ইন্দ্রজিত যে ইন্দ্রজিত, যে কদাচিৎ চেঁচিয়ে হাসে, সে-ও।

একটু পরে প্যাগোডার ধার দিয়ে একজন পাহারাওয়ালাকে আস্‌তে দেখা গেলো। সিতাংশু বল্‌লে, 'এই রে, the guardian of the garden আস্‌ছেন। শালা নিশ্চয়ই আমাদের হাসির শব্দ শুন্‌তে পেয়েছে—আমাদেরকে তাড়াবে এবার। ওঠো হে—' সবার আগে সিতাংশু উঠে' এক লাফে নৌকো থেকে নেবে গেলো। দ্বিজেনও তা'র লম্বা ঠ্যাঙের সাহায্যে কোনোরকমে ডাঙায় গিয়ে অবতীর্ণ হ'লো। কিন্তু দু'জনের পায়ের ধাক্কায় নৌকো গেলো জলের মধ্যে অনেকখানি সরে'—বাকি দু'জন পড়ে' রইলো। ঈশান হালটা নিয়ে খানিকক্ষণ নাড়াচাড়া কর্‌লো, কিন্তু শেকল-বাঁধা নৌকো বোকার মত এদিক-ওদিক ভাস্‌তে লাগ্‌লো।

এদিকে পাহারাওয়ালা অবতীর্ণ হ'য়ে হিন্দীভাষায় ওদের এই আইন-অমান্যকে যথেষ্ট তিরস্কার কর্‌ছে। হিন্দী বাৎ-এ দ্বিজেনেরই যা একটু দখল আছে বলে' সে পাহারাওয়ালার সঙ্গে তর্কে প্রবৃত্ত হ'লো—তা'কে বোঝাতে চেষ্টা কর্‌লে যে it is lawful to break bad laws। পাহারাওয়ালা দ্বিজেনের হিন্দী বা philosophy—বা কোনোটাই—

বুঝ্‌তে না পেরে ফ্যাল্‌ফ্যাল্‌ করে' তা'র মুখের দিকে তাকাতে লাগ্‌লো। হঠাৎ সিতাংশু একটানে তা'র হাত থেকে লাঠিটা নিয়ে জলের কাছে নেবে গিয়ে সেটা বাড়িয়ে ধর্‌লো। লাঠির অন্যদিক ধর্‌লো ঈশান, এবং সঙ্গে-সঙ্গে নৌকো ডাঙায় এসে ঠেক্‌লো। চট্‌পট্‌ ওরা দু'জন নেবে পড়্‌লো।

লাঠিটা পাহারাওয়ালাকে ফিরিয়ে দিয়ে সিতাংশু গম্ভীর মুখে বল্‌লে, 'Thank you'; তারপর : 'ভাগ্যিস লাঠিটা ছিলো, নইলে তোমাদের আজকে মুস্কিলেই পড়্‌তে হ'তো। সময়-সময় পুলিশের লোকও পাব্লিকের কাজে লেগে যায়—আশ্চর্য্য!'—আবার চারজনে হেসে উঠ্‌লো।

পুলিশের লোকটি এবার অত্যন্ত অপমানিত বোধ করে' ধম্‌কে উঠ্‌লো, 'হাসো মৎ।'

এ-কথা শুনে' ওদের হাসি অবিশ্যি আরো বেড়েই গেলো। জমাদার সাহেব চটে' লাল হ'য়ে তীক্ষ্নস্বরে ওদেরকে শাসালো, 'হাসো মৎ!' তারপর বুঝিয়ে দিলে যে সে ইচ্ছে কর্‌লেই এই মুহূর্ত্তে ওদেরকে পাঁচ-আইনে দিতে পারে, কারণ মেম্বর-আদ্‌মি ছাড়া ও-নৌকো ব্যবহার কর্‌বার অধিকার কারো নেই।

সিতাংশু মধুর আপ্যায়নের হাসি হেসে বল্‌লে, 'চটো মৎ, জী। Don't lose your temper—সম্‌ঝাতা? আর, হাম্‌লোক ভি আভি, মেম্বর হো যায়গা।—দেখ্‌লে তো, দ্বিজেন, ক্যাসা চোস্ত হিন্দী বলে' দিলাম!'

সিতাংশু ভদ্রস্বরে বল্‌লে : 'Good-night, guardian-angel.'

আইনের প্রতিমূর্ত্তির উদ্দেশে বাহুর ভঙ্গী করে' সে বন্ধুদের সঙ্গে বাইরের দিকে এগোতে লাগ্‌লো।

চট্‌ করে' গার্ড্‌ন্‌-এর সব ইলেকট্রিক আলো নিবে' গেলো।

'আটটা। ভাগ্যিস্‌ জমাদার-সাব এসে উপস্থিত হয়েছিলেন; নইলে গল্প কর্‌তে-কর্‌তে ইন্দ্রজিত হয়-তো ওর এন্‌গেইজ্‌মেণ্ট-এর কথা ভুলে'ই যেতো। ঠিক সময়েই ওঠা গেছে। বাড়ি ফিরে' সেজে-গুজে ন'টার ভেতর পৌছতে পার্‌বে। ন'টাই তো সময়?' সিতাংশু ইন্দ্রজিতের দিকে তাকালো।

'চিঠিতে কোনো সময় specify করা নেই।'

'Women being what they are', দ্বিজেন বল্‌লে, 'তা আশাও করা যায় না। মেয়েরা চিঠিতে তারিখ দেয় না; punctuate করে না;—এবং punctuality বলে' কোনো কথা ওদের ভাষায় নেই।'

'তাই বলে'', সিতাংশু ইন্দ্রজিতকে সাবধান করে' দিলে, 'তাই বলে' তুমি রাত বারোটার সময় গিয়ে উপস্থিত হোয়ো না যেন। তোমার তো আবার কোনো ভদ্রতা-জ্ঞান নেই—যা খেয়াল হয়, তা-ই করে' বসো। ট্রপিক্‌স্‌-এ আটটা থেকে ন'টা হচ্ছে ডিনার-টাইম; ন'টার পরে কোনোরকমেই যাওয়া যায় না।—আর দ্যাখো, যদি শেষ পর্য্যন্ত না-যাওয়াই ঠিক করো, তা হ'লে কাল সকালে apologies পাঠাতে ভুলো না কিন্তু।'

তা-ই যদি সম্ভব হ'তো!—ইন্দ্রজিত ভাব্‌ছিলো—ঈশ্বর, তা-ই যদি সম্ভব হ'তো! ওর মনের প্রফুল্লতা একটু পরেই নিবে' গিয়েছিলো;

আবার ওর মনের অপার নিঃসঙ্গতা, মুখের বৌদ্ধ গাম্ভীর্য্য। এতক্ষণে রাস্তার গ্যাসের আলোয় ওর মুখ ভালোমত দেখা যাচ্ছে। সুন্দর নয়, এমন কি, সুশ্রীও নয়, কিন্তু অসাধারণ, ভিড়ের মধ্যে চোখে পড়্‌বার মত। হঠাৎ দেখে প্রথম যে-কথা মনে হ'বে, তা হচ্ছে এই যে ইন্দ্রজিতের মধ্যে মোঙ্গোল-রক্ত খুব বেশি। রঙ্‌টা চীনেদের মত হল্‌দে, নাকও চ্যাপ্টা, চুল উল্টে' দে'য়ায় কপাল ব্যাপারটা বড্ড বাড়াবাড়ি কর্‌ছে বলে' মনে হয়। ছোট, কিন্তু অত্যন্ত তীক্ষ্ণ চোখ ; ভুরু নেই বল্‌লেই চলে ; চোখের নীচে গোটা কয়েক বসন্তের দাগ। কিন্তু ওর মধ্যে যে আর্য্য-রক্তও একটু-আধটু আছে, তা'র প্রমাণ দিচ্ছে ওর দৈর্ঘ্য ; জুতো-সুদ্ধ প্রায় পাঁচ-ফুট-দশ। আর, নিজকে বহন কর্‌বার ওর এমন-একটি কায়দা আছে, যা'তে ওকে দেখে খুব উঁচু দরের একজন লোক মনে হয়। মুখটা দেখ্‌তে ভালো না হ'লেও তা'তে একটা মোহ আছে, যা'র জন্য তাকিয়ে থাকৃতে ইচ্ছে করে। এবং এই কুৎসিত মুখও বাস্তবিক সুন্দর হ'য়ে ওঠে ওর মেয়ে-মার্কা হাসির সময়। সেই হাসিই ইন্দ্রজিতের beau geste ; শুধু সেই হাসি দেখেই বোঝা যায় যে ইন্দ্রজিত একজন রক্তমাংসের মানুষ। তা ছাড়া, প্রায় সব সময়েই ওর মুখ দেখে মনে হয় মুখোস ; মূর্ত্তির মত অচল ; তা'তে কোনো ভাবের ব্যঞ্জনা নেই—বুদ্ধের মুখের মত নিস্পৃহ ঔদাস্যে তা জমে' গেছে। সেই মুখোসের আড়ালে ও যে কী ভাব্‌ছে, তা কিছুতেই বোঝ্‌বার উপায় নেই। এবং ওর স্থবির মুখের সঙ্গে ওর আচার-ব্যবহারেরও পরিপূর্ণ সামঞ্জস্য ; কোনো বিষয়েই ওর উৎসাহ নেই, আনন্দ নেই, চলাফেরায়, কথাবার্ত্তায় ক্ষিপ্রতা নেই ; এক কথায়,

vitalityর অভাব। অভাব, কারণ জন্ম থেকেই ইন্দ্রজিত অসুস্থ ; ওর গায়ের হল্‌দে রঙের আসল কারণ চীনে পূর্ব্বপুরুষ নয়, অ্যানেমিয়া ;—ক্রনিক অ্যানেমিয়া :—বোতলে-বোতলে হিমোগ্লোবিন আর পোর্ট্ আর বভ্‌রিল আর এটা-ওটা-সেটা খেয়েও তা সার্‌লো না। শরীরের রক্তে red corpuscle-এর সংখ্যা কম বলে'ই ওর স্বভাবও হয়েছে নিস্তেজ, নির্জীব ; বোধ হয় মুখের চেহারাও সেই জন্যই হয়েছে জমাট। কপাল-দোষে (literally কপালদোষে, কারণ ওর প্রকাণ্ড কপাল দেখেই মেয়েরা প্রথমে আকর্ষিত হয়) ও জীবনে বহু নারী-সঙ্গ পেয়েছে, কিন্তু তেমন একান্ত উপভোগ ওকে দিয়ে হয় নি—ওকে দিয়ে হ'বার নয়। এই রকম অস্বাস্থ্যের সঙ্গে বাইরের অবস্থার প্রতিকূলতা একত্র হয়েই মানুষকে মর্বিড করে' ছাড়ে ; কিন্তু সুখের বিষয়, ইন্দ্রজিতের জীবন মোটের ওপর আরামেই কেটে এসেছে ; ভাগ্যের বিরুদ্ধে তা'র কোনো নালিশ ছিলো না ; নিজের অস্বাস্থ্য, উপভোগ-অক্ষমতা ও ভদ্রলোকের মত মেনে নিয়েছ, তা নিয়ে ওর প্যান্‌প্যানানি একেবারেই নেই। চিরকাল কোনো কাজ না করে' ও ক্লান্ত ; এত অলস যে উপন্যাস আকারে বড় হয় বলে' তা পড়্‌তে পারে না ; সাত বছর ধরে' ও যত কবিতা লিখেছে, সব কুড়িয়ে-কাচিয়ে একত্র করে' কোনো রকমে ছোট একখানা বই বা'র করেছে। ওর বেশির ভাগ কবিতাই সনেট, কারণ সনেটের একটা মস্ত সুবিধে এই যে চোদ্দ লাইনের বেশি লিখ্‌তে হয় না। অনেক সময় চোদ্দ লাইনও এক দমকে ওা লেখা হয় নি; চার লাইন লিখেই হাঁপিয়ে পড়েছে। বই বা'র কর্‌তেও ওর বেজায় আল্‌সেমি ; অনেকদিন ধরে'ই জল্পনা চল্‌ছিলো ; শেষটায় ঈশান নিজে গরজ করে' ওর জানা এক প্রকাশককে

দিয়ে বই বা'র করিয়ে নিলে। ঈশান ইন্দ্রজিতের কবিতা খুব পছন্দ করে; ওকে আরো লেখ্‌বার জন্য অবিশ্রান্ত উৎসাহ দেয়, বৃথা উৎসাহ দেয়। মর্জ্জি যখন হয়, ইন্দ্রজিত কায়ক্লেশে একটি সনেট শেষ করে; শেষ করে' অবিশ্যি ঈশানকেই সবার আগে দেখায়। ঈশানের প্রশংসা শুনে' ও শিশুর মত খুসি হ'য়ে ওঠে; তখনকার মত হয়-তো ওর মনে অ্যাম্বিশ্‌ন্‌ও জ্বলে' ওঠে, কিন্তু পরের মুহূর্ত্তেই ওর মনে হয়—দূর ছাই! আমার কিছুই হ'বে না। যশের আকাঙ্ক্ষাকে মনে-মনে কায়েমি কর্‌বার মত শক্তিও ওর নেই। চেষ্টা কর্‌বার পরিশ্রমের ভয়ে ও দিব্যি আরামে আগে থেকেই হার মেনে বসে' থাক্‌বে। কবিতা ও যা লেখে, ভালোই লেখে; কিন্তু ও যে সত্যি-সত্যি ভালো লেখে, এটুকু বিশ্বাস কর্‌বার মত মানসিক নিষ্ঠাও ওর নেই। অবিশ্যি ওর কবিতায় passion নেই; কী করে'ই বা থাক্‌বে?—জীবনে কোনো প্রবল passion অনুভব কর্‌তে ও তো শারীরিকভাবেই অসমর্থ। কিন্তু ওর যৌন জীবনের বহুমুখিতার ফলে ওর কবিতা যা হ'তে পার্‌তো—উদাস, বিতৃষ্ণ, blasé—তা হয় নি; হয় নি যে, সেটা আশ্চর্য্য। কেমন করে' যেন ওর মধ্যে এমন একটা দিক রয়ে' গেছে, যা দিয়ে ও একটি মেয়েকে কল্পনায় সত্যি-সত্যি ভালোবেসেছে; যা'র সঙ্গে অন্ধকারে ও মুখোমুখি, চুপচাপ বসে' থাক্‌তে ভালোবাসে; যা'র সঙ্গে পাশাপাশি বসে' ও রাফায়েলের ছবি দেখে, রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে এলে যা'র প্রত্যেকটি হলুদ-মাখা আঙুলে ও চুমো খায়। সেই থেকে ওর কবিতার জন্ম; অত্যন্ত সহজ ভাষায় বলা সহজ মনের কথা; মুহূর্ত্তের এক মূড্‌ নিয়ে একটি সনেট। কোনো হৈ-চৈ নেই; প্রকাণ্ড 'আইডিয়া'র হাস্যাস্পদ

বিস্ফারণ নেই; ছোটখাটো কথা, সাধারণ, ঘরোয়া background। Passion না থাকলেও মাধুর্য্য আছে, কোমলতা আছে;—এবং এইটেই সব চেয়ে আশ্চর্য্য। আবার, আশ্চর্য্য নয়ও; কারণ, এমনো হ'তে পারে যে জীবনে ও যে জিনিষগুলো প্রকাশ করতে পারে না বা চায় না, কবিতায় সেইগুলো বা'র করে' দিয়ে বাঁচে; কবিতা ওর আশ্রয়; নিজের কাছ থেকে নিষ্কৃতি। সেই জন্যই ওকে দেখে ওর কবিতায় বিশ্বাস হওয়া কঠিন। ও যে হৃদয় দিয়ে কখনো কিছু অনুভব করতে পারে, ওকে দেখে তা মনে হয় না। ওকে সর্ব্বদা শুধু একটি জিনিষ খুঁজ্‌তে দেখা যায়—শারীরিক স্বাচ্ছন্দ্য, আরাম। যেমন, এখন। তা-ই যদি সম্ভব হ'তো, সে মনে-মনে ভাবছিলো, হে ঈশ্বর, তা-ই যদি সম্ভব হ'তো! যদি আজ রাত্তিরে না গিয়ে কাল সকালে একখানা ভদ্র চিঠি পাঠালেই চল্‌তো! বাড়িতে একখানা আধ-পড়া এডগার ওয়ালেস্ অপেক্ষা করছে; রাত্তিরে শুয়ে'-শুয়ে' সেটা শেষ করা যেতো—ভাব্‌তেই আরামে তা'র চোখ বুজে' আসে। তা তো নয়—যাও এখন নেমন্তন্ন খেতে; খেলে হজম হ'বে না; না খেলে মিস্ দত্ত পীড়াপীড়ির চোটে অস্থির করে' তুল্‌বেন—মহা মুস্কিল! ঠিক আজ্‌কেই আবার তার পেটের ব্যাথাটাও একটু-একটু হচ্ছে—নাঃ, মাংস-টাংস খাওয়া কোনোরকমেই চল্‌বে না। তা খাওয়া যেমন-তেমন, কিন্তু খাওয়ার আগে আর পরে যে আলাপ করবার পালা আছে, সেইটেই তো সাংঘাতিক। মাঝে-মাঝে দু' একটা কথা না বল্‌লেই নয়; ম্যানার্স বলে' একটা জিনিষ আছে। আবার, মিস্ দত্ত লিখেছেন, তাঁর সঙ্গে নাকি তাঁর এক বন্ধুও থাকেন—কী যেন নাম। আশা করা

যাক্, মেয়েটি তুখোড় নয়, কথা কম বলে। সে যা-ই হোক্, বাড়ি ফির্তে-ফির্তে এগারোটা তো বটেই—কী শাস্তি! যদি না গিয়ে চল্তো! কিন্তু কেন যে না গেলেই চলে না, এ-কথা ইন্দ্রজিত নিজকে একবার জিজ্ঞেসও কর্লো না। যে-ক্ষমতার হাতে সে ধরা দিয়েছে, সে তা'র চাইতে অনেক বেশি শক্তিমান। সেই তা'কে ঠেলে' নিয়ে যাচ্ছে। যেতে তা'কে হ'বেই।...

চৌরঙ্গীর কাছাকাছি এসে ওদের সঙ্গে এক দশমীর মিছিলের সঙ্গে দেখা। প্রতিমা নিয়ে ঢাকঢোল বাজিয়ে গঙ্গায় চলেছে ভাসান দিতে। 'Life is hell,' সিতাংশু ঠোঁট বাঁকিয়ে বল্লে, 'চৌরঙ্গীতেও এ-সমস্ত উৎপাত!'

ঈশান বল্লে, 'দ্যাখো, বিজ্ঞানের সাহায্যে আমরা যতই সভ্য হই নে কেন, অত্যন্ত সাবেকি বর্ব্বরতাগুলো কী করে' যেন টিঁকে' থাকেই। কিছুতেই তাড়ানো যায় না। যেমন ধরো, দুর্গোপূজো, গোরুর গাড়ি, বিয়ে।'

'ও, আজকে তো বিজয়া-দশমী', দ্বিজেনের হঠাৎ মনে পড়্লো, 'আজকে তো আত্মীয়দের সঙ্গে দেখা কর্তে হয়।'

'তোমার আবার আত্মীয় এলো কোত্থেকে?' সিতাংশু জিজ্ঞেস কর্লে।

'কেন? আমার কাকা—'

'তোমার কাকা? ও—। আচ্ছা, দ্বিজেন, তোমার খুড়্তুতো বোন মীরার সঙ্গে না ইন্দ্রজিতের বিয়ে হ'বার কথা হচ্ছিলো?'

'সে ইন্দ্রজিতকেই জিজ্ঞেস করো।'

'এই ইন্দ্রজিত, তোমার সঙ্গে না মীরার বিয়ে হ'বার কথা হচ্ছিলো?'

ইন্দ্রজিত কথাটা শুনতেই পেলো না। সিতাংশু প্রশ্নের পুনরাবৃত্তি করলে।

এইবার ইন্দ্রজিত শুনতে পেলো, কিন্তু বুঝতে পারলো না। সিতাংশু প্রশ্নটা তৃতীয়বার বললে।

'কথা তো একরকম ঠিক হ'য়েই আছে।' ইন্দ্রজিত জবাব দিলে, 'যদি সত্যি-সত্যি বিয়ে করি, মীরাকেই করবো।'

'শীগ্‌গিরই করে' ফ্যালো না, বাপু,' সিতাংশু বললে, 'কত আর সময়ের আর নিজের বাজে খরচ করবে!'

'শীগ্‌গিরই করবো '

'ইন্দ্রজিত যখন বলে, "শীগ্‌গিরই" ', ঈশান বললো, 'তখন তা'র মানে ধরবে "পাঁচ বছর পরে"।'

'একটা কথা আমি ভাবি, ইন্দ্রজিত,' দ্বিজেন জিজ্ঞেস করলে, 'কী করে' মীরাকে তোমার পছন্দ হয়? হিন্দু ঘরের সাধারণ মেয়ে—শুধু পরমা সাধ্বী স্ত্রীই হ'বে—না হ'য়ে পারবে না; আর-কিছু নয়।'

'ও-ই ভালো; বিয়ে করার পক্ষে ও-ই ভালো।' বলে' ইন্দ্রজিত তাড়াতাড়ি এগোতে লাগ্‌লো, 'ওই যে একটা খোলা আসছে—ওটাই নেবো।'

সিতাংশু বললে, 'আচ্ছা', good-night। ইন্দ্রজিত: বলো, good-night।'

ইন্দ্রজিত বললে, 'Good-night।'

'আমিও তা হ'লে good-night', দ্বিজেন বললে, 'কাকাবাবুর বাড়িতে বিজয়ার দেখাটা সেরেই আসি।'

মোড়ে শ্যামবাজারের তিনটে ঠাসা বাস্ সার বেঁধে দাঁড়িয়ে; কণ্ডাক্টরগুলো তারস্বরে চীৎকার কর্‌ছে: 'খালি গাড়ি—আসুন্ স্যার্—তিন পয়সা—তিন পয়সা—ওয়েলিংটন-বৌবাজার-হ্যারিসন রোড—তিন পয়সা—।' দ্বিজেন সবার সাম্‌নের বাস্‌টায় উঠে' পড়ামাত্র সেটা ছেড়ে দিলো। সেটাতে আর ঠিক একটি লোকের দাঁড়াবার জায়গা ছিলো।

সিতাংশু বলে' উঠ্‌লো, 'অসহ্য!'

ঈশান জিজ্ঞেস্ কর্‌লে, 'কী?'

'এই বাস্‌গুলো। শহর বটে কল্‌কাতা! কল্‌কাতার ট্যাক্সি, কল্‌কাতার বাস্, কল্‌কাতার টেলিফোন্-সিস্‌টেম্ পৃথিবীর মধ্যে সব চেয়ে খারাপ।'

'কিন্তু কল্‌কাতার রেস্তোরাঁগুলো মোটের ওপর চলনসই। আপাতত—আর-কিছু কর্‌বার নেই যখন—কোথাও যাওয়া যাক্, চলো।'

'Right, বাড়ি-ফেরার কথা এখন ভাবা যায় না। The night is yet young.'

'The night is just born, বল্‌তে পারো।—ওয়ালেইস্-এ?'

'Right!' সিতাংশু ঈশানের কাঁধে রীতিমত জোরালো এক চড় বসিয়ে দিলে, 'তোমার মত লোক আর দেখ্‌লাম না, ঈশান। এমন অসাধারণ common sense! যখন যে-জিনিষ দরকার, ঠিক তখনি তা'র কথা মনে পড়ে;—অ্যাড্‌মিরেব্‌ল্!'

দু'জনে চৌরঙ্গী পেরোতে লাগ্‌লো।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

নীচে বস্‌বার ঘরে কাকাবাবুর ও রান্নাঘরে কাকীমার পদধূলি ও আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করে' দ্বিজেন ওপরে গেলো। ওপরটা অন্ধকার, চুপচাপ —ছেলেপিলেরা সব গেছে ভাসান দেখ্‌তে; ফিরে' এলেই তা'দের মিষ্টিমুখ করাতে হ'বে বলে' কাকীমা নিজে উনোনের আঁচে পুড়ে' মিষ্টি তৈরি কর্‌ছেন। শুধু কোণের একটি ঘরে আলো জ্বল্‌ছে; নিশ্চয়ই মীরা। মীরা একা-একা বসে' কী কর্‌ছে? ও কেন সবার সঙ্গে ভাসান দেখ্‌তে গেলো না? ভারি ঠাণ্ডা, শান্ত মেয়ে, মীরা; কোনো-রকম সখ নেই, আব্দার নেই; মা-বাপের হাতে নিজের অদৃষ্টকে ছেড়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত। আর, মা-বাবা তাঁদের এই মেয়েকে সযত্নে সর্ব্বপ্রকার আধুনিকতা থেকে রক্ষা করে' এসেছেন; মীরার মধ্যেও কোনোদিন বিদ্রোহের লেশমাত্র সূচনা দেখা যায় নি। মীরা কোনোদিন ইস্কুলে পড়ে নি; এবং ওর বাড়ির আব্‌হাওয়া বিদ্যাচর্চ্চার বিশেষ অনুকূল নয় বলে' লেখাপড়া ও সামান্যই শিখেছে; বাড়ির বাইরের পৃথিবীটা দেখ্‌তে কেমন, এ-বিষয়ে ওর ধারণা খুব অস্পষ্ট। কিন্তু এই সবই মীরা অকাতরে মেনে নিয়েছে, ভুলে'ও কোনোদিন প্রতিবাদ করে নি। এই ধরণের 'মাটির মানুষ' দ্বিজেন একেবারেই পছন্দ না কর্‌লেও মীরার প্রতি তা'র মনে স্নেহ ছিলো। এক অদ্ভুত, দুর্ব্বোধ্য ভাবে মীরাকে সে ভালোবাস্‌তো। এই ধরণের মেয়েদের নিয়ে যা'রা পবিত্রতা-পবিত্রতা বলে' হৈ-চৈ করে, দ্বিজেন তা'দের একজন নয়। পবিত্রতায় দ্বিজেন বিশ্বাস করে না। অক্ষুণ্ণ কৌমার্য্যেরও সে—উপাসক হওয়া দূরে থাক্—

খুব পক্ষপাতীও নয়। কিন্তু তবু, মীরাকে সে তাচ্ছিল্য কর্‌তে পার্‌তো না; সে মনে-মনে এটা অনুভব কর্‌তো যে—আর যা-ই হোক্, মীরা খাঁটি। মীরার যত অসম্পূর্ণতাই থাক্, ওর মধ্যে ভেজাল কিছু নেই। এবং দ্বিজেনের পরিচিত 'আধুনিক' মেয়েদের মধ্যে ক'জনের সম্বন্ধে এ-কথা বলা যায়? আধুনিকতায় নিজকে মানিয়ে নেবার মত যোগ্যতা অনেকেরই নেই, এবং তা'র ফল যা হয়…। তবু, তবু—এম্‌নি ভেবে দেখ্‌তে গেলে, বেঁচে মরে'-থাকার চাইতে মেকি প্রাণশক্তির বিশ্রী উগ্রতা বরং ভালো; ভাণ কর্‌তে-কর্‌তে অনেক জিনিষ সত্যিকারের হ'য়ে পড়ে। কিন্তু মীরা—মীরার কথা আলাদা। মীরাকে সে কোনোরকমে অবজ্ঞা কর্‌তে পারে না; চেষ্টা করে' দেখেছে, পারে নি। ওর কথা মনে পড়্‌লে দ্বিজেনের ভালো লাগে; ওর কাছে এলে ভালো লাগে, যদিও ওর সঙ্গে গল্প করা যায় না। ওকে দেখ্‌তেই ভালো লাগে; ওর পাৎলা, সুন্দর শরীর আর ভীরু, ক্লান্ত চোখ—ইন্দ্রজিত তো মুগ্ধ হ'য়ে গিয়েছিলো—মানে, ইন্দ্রজিতের পক্ষে যতটা মুগ্ধ হওয়া সম্ভব। মীরার কথা উঠ্‌লে ইন্দ্রজিত বল্‌তো, মুখটা সুন্দর নয় বটে, কিন্তু চমৎকার শরীর—বিউটি-ফুল্। After all, সৌন্দর্য্য ব্যাপারটা আবয়বিক, শরীরের form-এর—মুখশ্রীর নয়।

ইন্দ্রজিতের কথা মনে করে' দ্বিজেনের হাসি পেলো। ইন্দ্রজিত তো ও-কথা বলে'ই খালাস; মুখে বিয়ে-বিয়ে কর্‌লেও ও যে সত্যি-সত্যি অদূর ভবিষ্যতে বিয়ে কর্‌বে, এমন মনে হয় না। ইচ্ছে হয়-তো আছে, কিন্তু উৎসাহে কুলোয় না। বিয়ে-করা আবার যে হাঙ্গাম! এদিকে মীরাকে দেখে মনে হয়, ইন্দ্রজিতের জন্য ও নীরবে মরে' যাচ্ছে। যাক্,

আজ এলোই যখন, মীরাকে এ-বিষয়ে একটু বাজিয়েই দেখা যাবে—যদি সম্ভব হয়।…আস্তে-আস্তে সে ঘরে গিয়ে ঢুক্‌লো।

দরজার দিকে পেছন দিয়ে টেবিলের সাম্‌নে দাঁড়িয়ে মীরা কী-একটা জিনিষ হাতে নিয়ে ঝুঁকে পড়ে' দেখ্‌ছে। দ্বিজেনের পায়ের শব্দ সে শুন্‌তে পেলো না। এমন কী জিনিষ, যা মীরা এত মন দিয়ে দেখ্‌ছে? দ্বিজেনের অ-পুরুষোচিত কৌতূহল হ'লো। পা টিপে'-টিপে' সে মীরার পেছনে গিয়ে দাঁড়ালো। মীরার হাতে ইন্দ্রজিতের এক ফোটোগ্রাফ। বাস্‌ট্‌। চাদর জড়িয়ে খুব কবি-কবি চেহারা হয়েছে। এই তো কিছুদিন আগে ইন্দ্রজিত বিগ্রাকে দিয়ে এই ছবি তুলিয়েছিলো—ছবি-হিসেবে খুব ভালো হয়েছে; বিগ্রার শো-কেইস্‌-এ রাখ্‌বার মত। খুসি হ'য়ে ইন্দ্রজিত দ্বিজেনকে দিয়েছিলো এক কপি; তারপর দ্বিজেনের কাকীমা তাঁর সম্ভাব্য জামাতার প্রতিকৃতি আত্মীয়স্বজনদের দেখাবার জন্যে সেখানা নিয়ে আসেন। সেই ছবি মীরা…এতদূর! যে-প্রেমের কোনো মূল নেই, তা যে এতদূর যায় দ্বিজেনের তা ধারণা ছিলো না। কিন্তু এটা তো প্রেম নয়, love-affair নয়;—এটা হচ্ছে আইনসঙ্গত, সুপবিত্র, হিন্দু-বিবাহের ব্যাপার—এতে কোনো দোষ নেই, এতে 'খারাপ' কিছু নেই।…দ্বিজেন হেসে উঠ্‌লো।

বিদ্যুতের মত মীরা ফিরে দাঁড়ালো; তা'র হাত কেঁপে গিয়ে ফোটোগ্রাফটি টেবিল ফস্‌কে মেঝের ওপর পড়ে' গেলো। মীরার মুখ শাদা, চোখ একেবারে ফেটে বেরুচ্ছে, বাঁ হাত ঠোঁটের ওপর চেপে সে আর-একটু হ'লেই চীৎকার করে' উঠ্‌তো। চট্‌ করে' নিজকে সাম্‌লে নিয়ে সে ছুটে' ঘর থেকে বেরিয়ে যাচ্ছিলো, দ্বিজেন খপ্‌

করে' ধরে' ফেললো তা'র হাত। বললে, 'যাচ্ছো কোথায়? বোসো।'

আপত্তি করবার ক্ষমতা মীরার ছিলো না; শান্তভাবে সে একটা চেয়ারে বসে' পড়লো।

দ্বিজেন মেঝে থেকে ফোটোগ্রাফটি কুড়িয়ে বললে, 'কোথায় ছিলো এটা? ঐ আলমারিতে? রেখে দাও না তুলে'।'

মুহূর্ত্তে মীরার কপাল থেকে ঘাড় পর্য্যন্ত টকটকে লাল হ'য়ে উঠলো। লজ্জার ভার সইতে না পেরে সে দুই হাতে মুখ ঢাকলে।

* * *

'আমি যা কিছুতেই বুঝতে পারি নে,' সিতাংশু বললে, 'তা হচ্ছে এই যে ইন্দ্রজিত কী করে' মীরার মত মেয়েকে বিয়ে করতে রাজি হ'তে পারে।'

ভেয়ার্মুথ-এর গ্লাশে এক চুমুক দিয়ে ঈশান একটা সিগ্রেট ধরালে। —'এর চেয়ে স্বাভাবিক আর কিছুই নয়। ইন্দ্রজিত অলস, বেজায় অলস; একজন চুল-বব-করা, ককটেইল-খেকো বৌ নিয়ে hectic life কাটানো ওকে দিয়ে কুলিয়ে উঠবে না। ও-সব জিনিষে ওর রুচিও নেই; তোমার মত ও gaietyর ভক্ত নয়। অতটা কেন, ওর চাইতে অনেক মৃদু স্তরের জীবন—বায়োস্কোপ-থিয়েটার-গান-বাজনা-সাহিত্য, অনেক রকম কথাবার্ত্তা, নানালোকের সঙ্গে মেলামেশা নিয়ে যে-সামাজিক জীবন, তা-ও ওর ধাতে সইবে না। তা ছাড়া, বেচারা মেয়েদের পাল্লায় পড়ে' এত ভুগেছে যে এখন ও ক্লান্ত হ'য়ে পড়েছে। ও সুখ চায় না, কারণ পেলেও ও তা উপভোগ করতে পারবে না।

ও চায় আরাম, শান্তি, 'নশ্চিন্ততা। বিয়ে-না-করা অবস্থায় তো আর ওকে কম হাঙ্গাম পোয়াতে হয় নি; বিয়ে করে' ও আর কোনো ঝক্-মারির জন্যে প্রস্তুত নয়। তাই মীরাকে ওর অত পছন্দ। মীরার মত বৌ আজকালকার দিনে ও পাবে কোথায়?'

'তা-ও তো বটে', সিতাংশু একটু চিন্তা করে' বল্‌লে, 'এমন পশুর মত অসহায়, আমি-কেউ-নই-গোছের মেয়ে আজকাল বিরল হ'য়ে আস্‌ছে। কিন্তু মৃদুলা মেয়ের ললিত লাবণ্য ইন্দ্রজিতের কদ্দিন ভালো লাগ্‌বে? মীরার ধরণের মেয়েকে ও কোনোদিন কাছ থেকে ছাখে নি কিনা—তাই এদের সম্বন্ধে হয়-তো ওর মনে এখনো একটু মোহ আছে। বাঙ্‌লা কবিতায় ওদেরকে নিয়ে খুব দহরম-মহরম করা হয়। এরা সন্ধ্যাকালে তুলসী-তলায় প্রদীপ জ্বালে, এদের বুকে মৌচাক জমে' ওঠে, এদের দেখ্‌লেই চোখে জল আসে, বুনো ফুলের মত এদের মাধুর্য্য—আরো কত কী! আসলে, একটু কাছে গিয়ে ছাখো—এরা একটা কথা বল্‌তে পারে না, আর যখন বলে, উচ্চারণ ভুল করে; ক্রমাগত repression-এর ফলে এদের শরীর ও মন দুই-ই অসুস্থ; বাড়িতে কোনো অচেনা—মানে, 'পর'-পুরুষ এলে এরা অভদ্র চীৎকার করে' ছোট ভাইকে বল্‌তে বল্‌বে যে অমুকে বাড়ি নেই; সে-চীৎকার শুধু আগন্তুক কেন, বাড়িসুদ্ধ সবাই বোধ হয় শুন্‌তে পায়;—তা পাক্, তবু তো সতীত্ব বজায় রইলো! এমন সাংঘাতিক সতীত্ব এদের যে তুমি যদি হঠাৎ পথে পড়ে' যাও, তা হ'লে অসভ্য ষাঁড়ের মত দিগ্বিদিক্ ভুল করে' ছুটে' পালাবে—তারপর অন্দরে গিয়ে জান্‌লা থেকে তোমাকে চোখ দিয়ে গিলে' খাবে। এই তো তোমার বুক-ভরা মধু বঙ্গের বধূ!

অবিশ্যি'—সিতাংশু এক চুমুকে বাকি স্টাউট্‌টুকু শেষ করে' ট্যাঙ্কার্ডটা টেবিলের ওপর নাবিয়ে রাখ্‌লে ; সঙ্গে-সঙ্গে কোত্থেকে যেন ওয়েইটারটা আবির্ভূত হ'য়ে আবার ট্যাঙ্কার্ড ভর্ত্তি করে' দিয়ে গেলো।—'অবিশ্যি আমি বল্‌ছি নে যে মীরাও এই রকম—আশা করি নয় ; কিন্তু তোমাদের মৃত্তুলা মেয়ের ললিত লাবণ্য—যা নিয়ে এত কাব্যি করা হয়—সেটা আসলে কী ব্যাপার, তা-ই বল্‌ছিলাম।' সিতাংশু ট্যাঙ্কার্ডে আর-এক চুমুক দিয়ে গাঢ়স্বরে বল্‌লে, 'আঃ। দাও হে একটা সিগ্রেট ; আমার গুলো ফুরিয়েছে।'

ঈশান পকেট থেকে তার কেইস্ বা'র কর্‌তে-কর্‌তে বল্‌লে, 'ঐ আল্‌কাৎরার মত কালো, নিমের মত তেতো তরল পদার্থগুলো কী করে' খাও ?'

'কী করে' খাই ? খেতে খুব ভালো লাগে যে। তা ছাড়া, শরীরও খুব ভালো হয় এতে। তুমি একটা ইডিয়ট ; তাই কোনোদিন বিয়ার কি স্টাউট্ খেতে শিখ্‌লে না। কী ছাইভস্ম কতগুলো লিকিয়ার খাও—শরীরের সজীবতা শুষে' নেয়।'

'নিলোই বা। তাই বলে' ঐ তেতো জিনিষগুলোকে আমি কিছুতেই বর্‌দাস্ত কর্‌তে পার্‌বো না।'

সিতাংশু হেসে উঠ্‌লো। ঈশান সিতাংশুর মধ্যে অনেক জিনিষই অ্যাড্‌মায়ার করে ; সব চেয়ে বেশি ওর হাসি। প্রচুর স্বাস্থ্য ; অজস্র আনন্দ ;—ওকে বন্ধু-হিসেবে পাওয়া একটা সৌভাগ্য। ঝর্‌ঝরে, শুক্‌নো, পরিচ্ছন্ন ছেলে ; ওর হাসি শুন্‌লেই মনে হয়, ওর ভেতরে কোনো ময়লা থাক্‌তে পারে না। মুখের ফর্সা রঙ্‌ বিয়ার খেয়ে-খেয়ে

প্রায় গোলাপী হয়েছে ; চোখে সোনার রিম্‌লেস্ চশ্‌মা মানিয়েছে ; ফিট্‌ফাট্ সৌখীন ;—যা'দের সঙ্গে ওর বেশি আলাপ নেই, তা'রা সবাই ওকে চালিয়াৎ ঠাওরায়। ঠাওরাবেই ; কারণ, আজকালকার বাঙালী ছেলেরা আধ-ময়লা জামা-কাপড় পরে' এইচ্, জি, ওয়েল্‌স্ আর বার্ট্রাণ্ড্ রাসেল আর কাউন্ট্ কাইজালিঙ্ আলোচনা কর্‌তে-কর্‌তে ঘুরে' বেড়ায় ; বড়-বড়, গাল-ভরা, প্রাণ-কাড়া আইডিয়া পেলে এরা আর-কিছু চায় না ; পৃথিবীর সব দুঃখের বিশাল সমুদ্র এদের বুকে—ভালো খাওয়া, ভালো পরা, ভালো থাকা প্রভৃতি সামান্য বিষয়ের দিকে নজর দে'য়ার এদের সময় কোথায় ? এ-হেন দেশে সিতাংশুর মত ছেলে দুর্ল্ভ। ঈশান অনেক দেখে-শুনে' বড়-বড় আইডিয়াকে ভয় কর্‌তে শিখেছে ; তাই তা'র অনেক সাহিত্যিক বন্ধুর চাইতে সিতাংশুর সঙ্গেই সে বেশি আরাম পায়। যান্ত্রিক সভ্যতা মানুষের কল্যাণ কর্‌ছে, না সর্ব্বনাশ ; উৎপীড়িত দরিদ্রের কবে দুঃখের অবসান হ'বে, 'Magic Mountain'-এর আসল সমস্যাটা কী—এ-সব প্রসঙ্গ সিতাংশু কখনো উত্থাপন কর্‌বে না ; বড় জোর জিজ্ঞেস কর্‌বে, 'মাইকেল আর্লেনের "লিলি ক্রিস্‌টিন" পড়েছো ?' ঈশানের মনে দুঃখ হয়, সিতাংশু কেন লিখ্‌তে পারে না ; তা হ'লে বাঙ্‌লা সাহিত্য—আর যা-ই হোক্, প্রকাণ্ড সব আইডিয়ার বোঝা থেকে মুক্তির স্বাদ অন্তত পেতো। ঈশান এর পরে যে-উপন্যাস লিখ্‌বে, তা'র নায়ক কর্‌বে সিতাংশুকে।...

সিগ্রেট ধরিয়ে সিতাংশু বল্‌লে, 'ইন্দ্রজিত গোড়ায় একজন সেন্টিমেন্টলিস্ট্ ; তাই বিয়ে কর্‌বার জন্যে একটি ষোলো বছরের

"লক্ষ্মী" মেয়েকে ও চায়। কিন্তু মীরাকে বিয়ে করে' ছ' মাসের মধ্যেই ও পস্তাবে।'

'ছ্যাখো সিতাংশু, তোমার বিবেচনার ওপর আমার শ্রদ্ধার অভাব নেই; কিন্তু মীরার সম্বন্ধে কিছুই না জেনে তুমি মতামত দিয়ো না। ইন্দ্রজিত মীরাকে বিয়ে কর্‌বে না তো কা'কে বিয়ে কর্‌বে, বলো?'

সিতাংশু তৎক্ষণাৎ জবাব দিলে 'কেন? ওর সঙ্গে যা'কে মানাবে, তেম্‌নি এক মেয়েকে। **Sweet sixteen**কে নয়। ললিতা লজ্জিতা লাবণ্যবতীকে নয়। আমাদেরি মত এক মেয়েকে।'

'আমাদেরি মত এক মেয়ে ইন্দ্রজিত খুঁজে' পাবে না; কারণ, আমরা পুরুষ। এবং খুঁজ্‌তে গিয়ে পাবে—কী? কয়েকটি বি-এ, এম্‌-এ পাশ-করা কায়দা-দুরস্ত মেয়ে; আর, এক রাশ ম্যাট্রিক-ক্লাশ-অবধি-পড়া আরো বেশি কায়দা-দুরস্ত মেয়ে। সাধারণের ভাষায় এরাই "শিক্ষিতা", "আলোকপ্রাপ্তা"। কিন্তু কী এদের শিক্ষার নমুনা? এম্‌-এ পাশদের কথাই ধরা যাক্; টেনিসন্‌-এর "Princess" এদের কাছে অমর মহা-কাব্য—অবিশ্যি গানগুলো না থাক্‌লেও চল্‌তো; কীট্‌স্‌ sensuous হ'লেও যে sensual নয়, বরং spiritual, এ-কথা প্রমাণ করে' ছাড়্‌বার জন্যে দীর্ঘ থীসিস্‌ লিখে' ফেল্‌তে পারে—অবিশ্যি, ইংরিজি যা লিখ্‌বে, তা ম্যুজিয়মে প্রিজার্ভ্‌ কর্‌বার মত। এরা রোজ আগাগোড়া খবরের কাগজ পড়্‌বে, আর মনে কর্‌বে, দেশকে এক পা করে' স্বাধীনতার দিকে এগিয়ে দিচ্ছে। টয়লেটের পেছনে ঢের পয়সা খরচ কর্‌লেও এরা সুন্দর সাজ্‌তে পারে না; কারণ কোন্‌ রঙের সঙ্গে কোন্‌ রঙ্‌ মানায়, সে-ধারণাই এদের নেই; এরা সুন্দর চলা-ফেরা

করতে শেখে না, ভদ্র ব্যবহার শেখে না, আলাপ করতে শেখে না। সামাজিক জীবনে এদের মত অপদার্থ কেউ নয়। সবার সঙ্গে মিশে' কথাবার্তা বলতে গেলে এদের গলা আটকে আসে; দু'তিনজনে এক কোণে ছোট একটি দল করে' গুজ্ গুজ্-ফিস্‌ফাস্ করবে, বিশ্রীভাবে giggle করবে। এই তো তোমার উচ্চশিক্ষিতা মেয়ে! সব চেয়ে মজা এই যে এরা অত্যন্ত sex-conscious, যা ছোটলোক-মেয়েরা তো নয়ই; ভদ্রঘরের "অশিক্ষিত" মেয়েরাও নয়। মনে হয়, কৌমার্য্য-স্খালন করবার সৎসাহস এদের নেই; অথচ, অনেক বয়েস অবধি অবিবাহিত থাকতে হয়; জীবনে কোনো বৈচিত্র্যও এরা আনতে পারে না, তাই অবিশ্রান্ত অসুস্থ জল্পনার ফলে এরা এক-একজন পাকা ফোঁড়ার মত টস্‌টস্ করছে—একটু ছুঁয়েছো কি কাৎরে উঠবে। তোমার সঙ্গে এরা কিছুতেই সহজভাবে আলাপ করতে পারবে না; কারণ, তুমি যে পুরুষ, এ-কথা এরা মুহূর্ত্তের জন্যেও ভুলতে পারবে না। তুমি কোনো কাজ নিয়ে গেলে এরা মনে করবে, তুমি ফ্লার্ট করতে এসেছো; আর ফ্লার্ট্ করবার উদ্দেশ্য নিয়ে গেলে মনে করবে, পূজো করতে এসেছো।' ঈশান অনেকক্ষণ পর ভেয়ার্মুথ-এর গেলাশে এক চুমুক দিয়ে রুমালে ঠোঁট মুছলে, তারপর একটা পোড়া দেশলাইয়ের কাঠি নিয়ে অ্যাশট্রের ছাইগুলো নাড়াচাড়া করতে-করতে আবার বলতে লাগলো: 'এ-ই তো তোমার কাল্‌চার্ড, আপ-টু-ডেইট, মডার্ন মহিলা! যে-সব জায়গায় ছেলেমেয়েদের একসঙ্গে পড়বার ব্যবস্থা আছে, সেখানেই এদের sex-consciousness সব চেয়ে মারাত্মকভাবে ফুটে' ওঠে। এমনভাবে এরা চলা-ফেরা করে, যেন এদের উপস্থিতিতে ইউনিভার্সিটি

ধন্য হ'য়ে যাচ্ছে। ছেলেদের চাইতে এরা অনেক উঁচুদরের জীব; এদের মেলামেশা মাষ্টার-শ্রেণীর জীবের সঙ্গে। আত্মসম্মান বলে' কোনো জিনিষ এদের নেই; অ্যানুয়েল স্পোর্টস্-এর দিন এরা প্যাভিলিয়নে বসে' চা খাবে—যদিও কেউ এদের বিশেষভাবে নেমন্তন্ন করে না; না দেয় এরা এক পয়সা চাঁদা। কলেজের সব ব্যাপারে এদের সবার আগে আহ্লাদীর মত এসে চেয়ার দখল করা চাই—যেন এরা মঙ্গলগ্রহ থেকে মাননীয় অতিথি এসেছে, কলেজের এরা কেউ নয়। অথচ,কলেজের সামাজিক জীবনের কোনো অংশ গ্রহণ কর্‌বার আগে এরা মরে' যাবে—ঘরে বসে' কুচুণ্ডীর মত gossip করার বেলায় খুব। আসল কথা, এরা আদৌ sport নয়; কলেজে পড়্‌তে এসেও এরা সত্যিকারের কলেজি জীবন কাটাবে না, ছাত্রদের সঙ্গে সমান হ'য়ে মিশ্‌বে না; হাত-পা গুটিয়ে, নাক শিঁট্‌কে, ঠোঁট উল্‌টিয়ে বসে' থাক্‌বে। এদের কাছ থেকে তুমি কী আশা কর্‌তে পারো, বলো?' গেলাশে চুমুক দিতে গিয়ে ঈশান দেখ্‌লো, খালি।

সিতাংশু বল্‌লে, 'আর-একটা নাও। আমার বোতল ফুরোতে দেরি আছে।'

'বলো ওয়েইটারকে।'

'Waiter! Another vermouth for this gentleman—সমঝাতা?'

''বহুৎ আচ্ছা, হুজুর।'

ঈশান বল্‌লে,'ওয়েইটারটা যদি বা তোমার ইংরিজি বুঝ্‌তে পারে,হিন্দী কিছুতেই বুঝ্‌বে না। বাঙলা বল্‌তে ইচ্ছে না করে ইংরিজিই বোলো।'

'মাঝে-মাঝে কিন্তু হিন্দী বলা উচিত। যতই ভুল হোক্, ওয়েই-টাররা খুব flattered বোধ করে। ওরা আশাই করে যে আমরা ভুল হিন্দী বল্‌বো; যত বেশি ভুল করি, ওরা মনে-মনে তত খুসি হয়। সত্যি বল্‌তে, নির্ভুল হিন্দী বল্‌লেই এদের চোখে নেবে যেতে হয়।'

ওয়েইটার একটা ফ্রেঞ্চ্ আর একটা ইতালিয়ান বোতল এনে জিজ্ঞেস কর্‌লে, 'মিক্‌স্‌ট্ ?'

ঈশান বল্‌লে, 'মিক্‌স্‌ট্।'

ওয়েইটার নিজকে সরিয়ে নেবার পর ঈশান সিগ্রেট ধরিয়ে আবার বল্‌তে লাগ্‌লো, 'আর, সব চেয়ে এদের মধ্যে যা অসহ্য—তোমার এই মডার্ন্ মহিলাদের মধ্যে—তা হচ্ছে এদের snobbery, এদের অসহ্য চাল। কোনো বিদ্যেই তো এদের অজানা নেই! এরা সবাই জীবনে দু' চারখানা ল্যাণ্ডস্‌কেইপ এঁকেছে, তুমি একটা টেবিলের ড্রয়িংও ঠিক-মত কর্‌তে পারো না; তাই অগস্‌টাস্ জন্-এর মর্ম্ম এরা যত বুঝ্‌বে, তোমার কি সাধ্যি তা'র আদ্ধেক বোঝ্‌বার দুরাশাও কর্‌তে পারো। এরা চীৎকার করে' রবিঠাকুর আর অতুল সেনের গান কলের মত গেয়ে যেতে পারে; তুমি 'যখন সঘন গগন গরজে'ও ঠিকমত গাইতে পারো না; তাই তুমি যদি ক্রাইজ্‌লারের বাজনা বা শালিয়াপিনের গান সম্বন্ধে কিছু বল্‌তে যাও, এরা মুখের ওপর না হ'লেও মনে-মনে হাস্‌বে। এদের মধ্যে এমন-কেউ নেই যে জীবনে গদ্যে বা পদ্যে—বিশেষ করে', পদ্যে—কিছু না লিখেছে; আর তুমি পরীক্ষায় প্রশ্নোত্তর আর চিঠি-পত্র ছাড়া কখনো কিছু লেখো নি; তাই গল্‌সোয়ার্দির উপন্যাস আর ইয়েট্‌স্-এর কবিতা

এরা কিছু না পড়ে' থাক্‌লেও ওদেরি সম্পত্তি—তুমি কেন অনধিকার-চর্চ্চা কর্‌তে আস্‌বে ? এই অর্দ্ধ-শিক্ষিত মেয়েদের মত হাস্যাস্পদ আর-কিছু নয়, অথচ বাঙ্‌লা দেশে দিন-দিন এদের সংখ্যা বেড়েই চলেছে। ফীমেইল-এডুকেশ্‌ন্‌-এর বিস্তৃতি ! গভর্ন্‌মেণ্ট্‌ আর সমাজ-হিতৈষীদের লাফালাফির শেষ নেই। অথচ এডুকেশ্‌ন্‌-এর নমুনা তো এই ! ছেলেদের মত যদি মেয়েরাও সবাই পাশের জোরে অর্থোপার্জ্জনে মন দিতো, তা হ'লে এর একটা ক্ষমা ছিলো ; কিন্তু, তা যখন নয়, তখন কতগুলো অর্দ্ধ-শিক্ষিত কিম্ভূত জীব তৈরি করে' লাভ কী ? লেখাপড়া যদি শেখাতেই হয়, ভালো করে'ই শেখাও—নইলে হরির নামে ফেলে' রাখো, চোদ্দ বছরে বিয়ে দাও—তা-ই বেশ। অনেক ভালো এদের চাইতে খাঁটি "অশিক্ষিত" মেয়েরা—"অশিক্ষিত",আর সম্ভব হ'লে,গ্রাম্য। তা'দের মধ্যে স্বাভাবিক সৌন্দর্য্য, বুদ্ধি, কমন-সেন্স্‌ থাকে ; তা'দের অমার্জ্জিত স্থূলতার একটা আলাদা charm আছে। মাঝে-মাঝে তা'দের মধ্যে দু'-একটি splendid animal দেখা যায়—যা কিনা আজকালকার এই অতি-সভ্য পৃথিবীতে বাস্তবিক বিরল। এদের কোনো high pretensions নেই ; এদের স্তরে নেবে এসে (না, উঠে' এসে ? ঠিক বলা যায় না) এদের সঙ্গে মিশ্‌লে সত্যিকারের সুখ পেতে পারো—'

'অন্তত শারীরিক।' সিতাংশু টিপ্পনী কাট্‌লো।

'অন্তত কেন ?' ঈশান জিজ্ঞেস কর্‌লে, 'শারীরিক সুখটা বুঝি তোমার গায়ে লাগ্‌লো না ?'

'শারীরিক সুখ গায়ে লাগে বই কি,' সিতাংশু একটু চিন্তা করে'

জবাব দিলে, 'Literally লাগে। এবং শারীরিক সুখ খুব বাঞ্ছনীয় জিনিষও বটে, কিন্তু সেটাই তো সব নয়। দু'জন মানুষ যে পরস্পরকে আকর্ষণ করে, এবং পরে সম্মিলিত হয়, তা'র আরো কারণ থাকে। যেমন ধরো, মন। খুবই তুচ্ছ ব্যাপার, মন ; কিন্তু তা'কে একেবারে অস্বীকার করলে চলে না। তারপর আর-একটা জিনিষ আছে—রুচি ; সেটাই সব চেয়ে ভাববার বিষয়। খাওয়া-শোয়া, বাড়ি-ঘর, বন্ধু-বান্ধব, সাহিত্য-শিল্প সম্বন্ধে রুচি। কেষ্টর হাইকোর্ট্‌শিপ্‌-এর থিওরিই আসলে ঠিক। মনের অমিল শেষটায় সয়ে' যায়, কিন্তু এই-সব ছোট-খাটো, দৈনন্দিন, প্রত্যক্ষ বিষয়ে অমিল নিয়েই বাধে গোলমাল। এমন কি, আহারে রুচি-বৈষম্যও ফ্যাল্‌না নয়। স্টিভ্‌ন্‌সন্‌ তো এ-ও বলেছেন যে দাম্পত্য সুখের প্রধান অংশ হচ্ছে খাবার টেবিলের হার্মনি। এতটা আমি বল্‌তে চাই নে, কিন্তু এটা ঠিক যে দু'জন মানুষ একত্র হয়, তা'দের রুচি মেলে বলে'। নইলে—স্বামী-স্ত্রীর কথা ছেড়ে দাও—তোমাতে-আমাতেও বন্ধুতা হ'তো না।'

'যদিও', ঈশান বল্‌লে, 'যদিও বিয়ার তোমার মুখে অমৃত, আর আমার তা এক চুমুক খেলেই বমি আসে।'

সিতাংশু এত জোরে হেসে উঠ্‌লো যে পাশের টেবিলের এক মেম ফিরে' ওর দিকে তাকালে। ঈশান বল্‌লো, 'এই, এত জোরে নয়। এখানে কেউ এত জোরে হাসে না। Spandrell-এর মত noiselessly হাস্‌তে পারো না ?'

'জানো না তো—চেঁচিয়ে-হাসা is good for your liver। আর লিভার ভালো থাকা মানেই সব ভালো থাকা। ইন্দ্রজিতটা

কখনো চেঁচিয়ে হাসে না, তাই তো ও যা খায়, কিছুই হজম হয় না। আর, হজম করতে পারে না বলে'ই ও বলতে গেলে কিছু খায়ই না। অথচ মীরা তো একজন গ্লাটন্।'

'তা-ই নাকি?'

'আমি অবিশ্যি জানি নে—জান্‌বোই বা কী করে'? কিন্তু যদি হয়—'

'তা হ'লে ওদের দাম্পত্য সুখের নৌকোডুবি হ'বে—কী?'

'আচ্ছা বেশ, তা না-হয় না-ই হ'লো। না-হয় মীরা ডিস্‌পেপ্‌টিক। আর, তা যদি বা না-ও হয়, তবু না-হয় ধরা গেলো, ওতে কিছু এসে যাবে না। R. L. S. be hanged. কিন্তু তবু, মীরার মত মেয়েকে বিয়ে করে' ইন্দ্রজিত সেন কী করে' সুখী হ'বে? লজ্জিতা ললিতার লাবণ্য ওর কদ্দিন ভালো লাগ্‌বে? পরমা সাধ্বী হিন্দু স্ত্রী; "পরপুরুষ" দেখ্‌লেও তা'র ফিট্ হয়; স্বামীর এঁটো পাতে ভাত খায়; স্বামীর পদযুগল বক্ষে ধারণ করে' অনির্ব্বচনীয় আনন্দ লাভ করে—ugh!' —সিতাংশু মুখের একটা বিশ্রী চেহারা করে' কাঁধ-ঝাঁকুনি দিলে—'তুমি কি সত্যি-সত্যি মনে করো, ইন্দ্রজিত সতীত্বের এই সব জুলুম সইতে পারবে?'

'যদি কেউ পারে, ইন্দ্রজিতই পারবে। অবিবাহিত্বে যা'রা খুব বেশি উচ্ছৃঙ্খল হয়, বিয়ে করে' তা'রাই হয় আদর্শ স্বামী; হঠাৎ তা'রা আবিষ্কার করে, আমাদের সাবেকি হিন্দু প্রথাগুলোই ভালো; পতি-গত-আত্মা পত্নীকে নিয়ে ঘরোয়া জীবন কাটাতেই তা'রা পছন্দ করে।'

ঈশানের উপদেশ ভুলে' গিয়ে সিতাংশু আবার হো-হো করে' হেসে উঠ্‌লো; এবার আরো জোরে।—'পবিত্র সতীত্বের প্রভাবে পাপিষ্ঠের ইষ্টত্বলাভ! The metamorphosis of a rake! O Bottom! Thou art translated!—"...a devoted husband, a loving father"—কী বলো? ইন্দ্রজিতের obtiuary noticeটা এখনি লিখে' ফেলা যাক্ না।'

সিতাংশুর হাসি থাম্‌লে পর ঈশান বল্‌তে লাগলো, 'কিন্তু তা-ই হয়। বিয়ের আগে যে যতটা বাড়াবাড়ি কর্‌বে, বিয়ের পর সে ততটা "ভালো" হ'য়ে যাবে—একেবারে হঠাৎ। সে কখনো দাম্পত্য ধর্ম্মের ব্যাঘাত কর্‌বে না—মানে, unfaithful হ'বে না; কারণ unfaithful হ'বার মত এনার্জি তা'র নিঃশেষ হ'য়ে গেছে বলে'ই সে বিয়ে করেছে। এবং নবীন-স্থকুমার কুমারীত্বর ওপর তা'রই সব চেয়ে বেশি লোভ—হ'বারি কথা। নারীত্বের মহিমার প্রতি হঠাৎ তা'র মধ্যে sickly sentimentality দেখা দেয়; বিবাহের অতুলনীয় পবিত্রতার কথা ভেবে সে maudlin হ'য়ে ওঠে। নবীনা স্থকুমারীকে ছাঁদ্‌না-তলায় সাত পাক ঘুরিয়ে ঘরে তো আনা গেলো; কিন্তু সে তো আর ক্লান্ত হ'য়ে পড়ে নি; তা'র জীবন তো সবে স্থরু, সে অনেক-কিছু আশা করে। কোনোদিন হয়-তো তা'র চিত্তচাঞ্চল্য ঘট্‌তে পারে; স্বামীর মানসিক জড়তায় সে একটুখানি আপত্তিও কর্‌তে পারে; এমন কি, তা'র বদলে অন্ত-কোনো পুরুষকে কল্পনাও কর্‌তে পারে বা। সেই-জন্ম আমাদের এই স্বামী এতই "ভালো" হ'য়ে গেলো যে তা'র বন্ধুদের সাম্‌নে স্ত্রীকে "বা'র"ও কর্‌লে না, রান্নাঘর আর ভাড়ার ঘর

আর শোবার ঘর নিয়ে স্ত্রীকে আদর্শ হিন্দু-বধূ বানিয়ে ছাড়্লো। পেলো আত্মীয়স্বজনদের বাহবা—ইস্, আজকালকার দিনে অমুকের মত ছেলে হয়! ওর বৌকে দিয়ে মা-র পায়ে তেল মাখিয়ে দ্যায় পর্য্যন্ত! ওদিকে, স্ত্রীর সঙ্গে অকপট ব্যবহার করেছে, এ-ও তা'র কম কৃতিত্ব নয়; স্ত্রীকে সে সব কথা খুলে' বলেছে; বলেছে: "দ্যাখো, আমি পঙ্কিল, আমি রুগ্ন, আমি ঘৃণিত—আমি তোমার যোগ্য নই। তোমার কাছ থেকে আমি ভালোবাসা চাই নে;—দয়া, করুণা পেলেই ধন্য হ'বো। নবীনা সুকুমারী এ-কথা শুনে' জিভ কেটেছে, কানে আঙুল দিয়েছে, স্বামীর পায়ে হাত ছুঁইয়ে সে-হাত মাথায়, ঠোঁটে, বুকে ঠেকিয়েছে। আদর্শ স্বামীর অকপটতা তবু ক্ষান্ত হয় নি; আত্ম-ত্যাগের মহিমায় অনুপ্রেরিত হ'য়ে বলে' চলেছে, "তুমি বল্‌তে পারো, এত জেনেও তোমাকে বিয়ে করা আমার উচিত হয় নি—"। নবীনা সুকুমারী বাধা দেয়, "আমি তা-ই বলেছি বুঝি?" কিন্তু আত্মত্যাগের মহিমা যা'কে অনুপ্রেরিত করেছে, তা'র কাছে তুচ্ছ সব বাধা; আত্মত্যাগ সে কর্‌বেই।—"না, উচিত হয় নি; কতটা অনুচিত হয়েছে এখন বুঝ্‌তে পার্‌ছি। বছর খানেক পরে হয়-তো সন্ন্যাসী হ'য়ে বেরিয়ে পড়্‌বো; তুমি থাক্‌তে পার্‌বে তো একা?" এটাকে রসিকতা মনে করে' নববধূর মন খুসি হ'য়ে ওঠে; সে হেসে বলে, "খুব পার্‌বো।" "তোমার জন্যই বেরিয়ে যাবো; তুমি তো কিছুতেই আমাকে আন্তরিক-ভাবে গ্রহণ কর্‌তে পার্‌বে না—আমি কেন তোমার জীবনটাকে নষ্ট করে' দিই?"—এখানে লজ্জিতা ললিতার চোখ ছল্‌ছল্ করে' ওঠে—"তোমার যা'কে ইচ্ছে হয় তা'কেই গ্রহণ কোরো; আমি কিছুমাত্র

আপত্তি তো কর্‌বোই না, বরং খুসি হ'বো।"—নিদারুণ অপমানে সাধ্বী হিন্দু-স্ত্রীর চোখ ফেটে জল পড়্‌তে থাকে।—"কিম্বা—আমার যে স্বাস্থ্য!—এমনো হ'তে পারে যে শীগ্‌গিরই আমি মরে' যাবো, তারপর তুমি নিজে পছন্দ করে' আবার বিয়ে কোরো—আমি অনুমতি দিয়ে যাবো।" এই হচ্ছে লিমিট—সুতরাং এতক্ষণে সুকুমারী পতি-পরম-গুরুর ফুঁপিয়ে-ফুঁপিয়ে কান্না সুরু হ'য়ে গেছে।—"ও কী? কাঁদ্‌ছো?" বলে' আদর্শ স্বামী স্ত্রীর হাতে একটু ঠেলা দিলে। অম্‌নি জীবন-মরণের ঈশ্বরের বুকে মুখ লুকিয়ে জন্ম-জন্মান্তরের খুকী-সহ-ধর্ম্মিণীর সে কী কান্না! আলিঙ্গন গভীর হ'লো। খানিকক্ষণ চল্‌লো কান্না। তারপর স্বামী জিজ্ঞেস কর্‌লো: "তুমি আমাকে ভালবাসো?" তবু চলেছে কান্না। "তুমি আমাকে ভালোবাসো?" একটু পরে: "হ্যাঁ।" "খুব?" "খুব।" কান্নার বেগ একটু কমে' এসেছে। "তুমি আমাকে সব দিতে পারো?" "যা চাও—সব।" আলিঙ্গন আরো গভীর হ'লো। "তোমার গয়নার বাক্স?" "হ্যাঁ।" "তুমি আমার জন্যে মর্‌তে পারো?" আলিঙ্গন আরো গভীর হ'লো। "হ্যাঁ।"... এম্‌নি করে' আদর্শ স্বামীর হাতে আদর্শ হিন্দু পত্নী তৈরি হ'তে থাকে।' ঈশান চেয়ারে হেলান দিয়ে সিগ্রেট ধরিয়ে অনেকখানি ধোঁয়া বুকের ভেতর টেনে নিলে।

সিতাংশু বল্‌লে: 'So! The Shewing-up of Indrajit Sen!'

'না—না।' ঈশান তাড়াতাড়ি বল্‌লে, ইন্দ্রজিতের কথা ভেবে এ-সব বল্‌ছিলাম, তা মনে কোরো না। ইন্দ্রজিত এ-type নয়।

ইন্দ্রজিতের case সম্পূর্ণ আলাদা! কুণ্ঠিতা কুমারী কন্যাকে ও-ও বিয়ে করতে চায়, করে' সুখীও হ'বে ; কিন্তু সে অন্য কারণে।'

'সে-কারণ তো আমি আগেই বলেছি ; ইন্দ্রজিত গোড়ায় একজন সেন্টিমেণ্টালিস্ট।'

'সেন্টিমেণ্টালিস্ট বোলো না ; ইন্দ্রজিত সেন্টিমেণ্ট্ নিয়ে ব্যবসা করে না। তবে সেন্টিমেণ্ট্ ওর আছে ; আমাদের অনেকের চাইতে বেশিমাত্রায় আছে। ওর মুখটা কাঠের মত শক্ত হ'লেও মনটা নরম—tender, বলা যায়। ওকে দেখে-শুনে' অবিশ্যি তা সন্দেহ করবার উপায় নেই, কিন্তু এই tenderness প্রকাশ পেয়েছে ওর কবিতায়। বাঙলা ভাষায় ওর মত প্রেমের কবিতা কেউ লেখে নি ;—একেবারে মনের কথা; গোপনে, আর একটিমাত্র লোকের কানে-কানে গুঞ্জরণ করে' বলা ; ভাষার, উপমার, অলঙ্কারের ঘটা নেই ; ছন্দের কসরৎ নেই, যদ্দূর সহজ, স্বাভাবিক হ'তে হয়। ওর কবিতার ভালোবাসায় বিশ্বাস তোমাকে করতেই হ'বে—তা এত আন্তরিক। এই ভালোবাসা হচ্ছে ওর আইডিয়েল, ওর ভোগক্লান্ত মনের সর্ব্ব-শেষ রোমান্স্ ; এই ভালো-বাসা ও জীবনে উপলব্ধি করতে চায়। আর, সেইজন্যই চায় মীরার মত "লক্ষ্মী" মেয়েকে বিয়ে করতে। ডাকসাঁইটে "grand passion" ওর কাছে অর্থহীন, "সর্ব্বনাশের নেশা"য় বা "সব-হারাবার আনন্দে" ডুবে' মরবার সখ্ ওর নেই, কানে শিষে না ঢেলেও সাইরেন্‌দের গানের মোহ ও এড়াতে পারে ; কারণ তা'দের ডাকে ও যখন সাড়া দেয়, ইচ্ছে করে,' জেনে-শুনে'ই দেয়। তাই, সব দেখে-শুনে' ও এখন আবিষ্কার করেছে যে ভালোবাসার মত ভালো জিনিষ

আর-কিছু নয় ; ভালোবাস্‌বে, এবং ভালোবাসা পাবে, তা'তে উচ্ছ্বাস থাক্‌বে না, কিন্তু আদ্র্ৰ্তা থাক্‌বে। এবং ওর এই ইচ্ছে উপলব্ধি কর্‌বার পক্ষে বিবাহিত জীবন সব চেয়ে প্রশস্ত, ; এবং এই শান্ত, ঘরোয়া ভালোবাসার বিনিময়ের পক্ষে মীরার মত কুণ্ঠিতা কুমারী-কন্যাই সব চেয়ে ভালো। ইন্দ্রজিত মনে-মনে পারিবারিকতার apotheosis রচনা কর্‌ছে : ও অনেক রাত্তিরে বাড়ি ফিরে' দেখ্‌বে, মীরা ভাত নিয়ে জেগে বসে' আছে, দুপুরবেলা ও খেতে বস্‌লে মীরা হাতে পাখা নিয়ে ভাত থেকে মাছি তাড়াবে ; মীরার জন্য হঠাৎ একদিন বারো টাকার এক জোড়া জুতো নিয়ে এসে ও তাক্ লাগিয়ে দেবে—মনে-মনে খুব খুসি হ'লেও মীরা স্বামীর অপব্যয়িতা নিয়ে প্যান্‌প্যান্ কর্‌বে, অসময়ে স্বামীর হাতে ধরা পড়ে' গেলে মীরা ঠোঁটের ওপর ঠোঁট চেপে মাথা নাড়্‌বে—তখন ইন্দ্রজিত ওর নাক টিপে' ধরে' ঠোঁট খুলিয়ে নিয়ে চুমো খাবে। ইন্দ্রজিতের কাছে এ-সব জিনিষ একেবারে নতুন—নতুন বলে'ই আশ্চর্য্য, রহস্যময় ; এ-ই ওর earthly paradise। বল্‌তে পারো, make-believe ; ব্যারির নাটকের মত মিথ্যে, আগাগোড়া বানানো, সত্যিকারের জীবন থেকে পালিয়ে-বেড়ানো। Silly—হয়-তো। কিন্তু হ'তেই দাও না ওকে একটু silly, ও যদি তা'তে সুখ পায় ; ওর খেল্‌না-স্বর্গকে তুমি কেন অস্বীকার কর্‌তে যাবে, যতক্ষণ ও সেই ভাণকে নিজের মেনে মনে নিচ্ছে ?'

সিতাংশু বল্‌লো, 'তাই তো ! আমি কেন অস্বীকার কর্‌তে যাবো ? কেন ? কেন ? ঠিকই তো। "Philosophy will clip an angel's wings." কিন্তু ইন্দ্রজিত তা'রএঞ্জেলটিকে দেখেছে ? আলাপ করেছে ?'

'মীরাকে? দ্বিজেনদের বাড়িতে কয়েকবার দেখেছে—দৈবাৎ। আলাপ? না, আলাপ করে নি। হিন্দু পরিবারের প্রথা-অনুসারে আলাপ করা যায় না। তা ছাড়া, ও চায়ও নি আলাপ কর্‌তে। এক-বারেই বিয়ে কর্‌তে চেয়েছিলো। দ্বিজেন প্রথমে ভেবেছিলো, ঠাট্টা কর্‌ছে। কিন্তু পরে কথাটা উঠ্‌তে-উঠ্‌তে মীরার মা-বাবার কানে উঠ্‌লো। তাঁরা তো লাফিয়ে উঠ্‌লেন। মীরার বাবা ইন্দ্রজিতের মা-কে এসে ব্‌ল্‌লেন, "ছেলের যখন ইচ্ছে, তখন বিয়েটা হ'য়েই যাক্।" '

'কিন্তু মেয়ে কী বলে?'

'জানো না তো—ইন্দ্রজিতের প্রতি প্রেমে মীরা হাবুডুবু খাচ্ছে।'

'এতই! কী করে'? ওদের না কখনো আলাপও হয় নি।'

'আসে যায় না। চোখে তো দেখেছে। তা'র ওপর, বিয়ের কথা হচ্ছে। মীরা, তাই, এখন থেকেই ইন্দ্রজিতকে idealize কর্‌তে আরম্ভ করেছে—মীরার প্রেম মানেই পূজো। অন্ধ, নির্ব্বোধ পূজো। হিন্দু বিবাহের মাহাত্ম্যই তো ঐখানে! হিন্দু মেয়েরা তো আর একটা মানুষকে বিয়ে করে না—তা'রা বিয়ে করে স্বামী-নামক একটা আই-ডিয়াকে। অ্যাপোলোকে পেলেও স্বামী, ক্যালিব্‌নকে পেলেও স্বামী। কোনো প্রভেদ নেই। স্বামী হ'লেই হ'লো।...'

*　　*　　*

একটা চীনে বাসনে করে' খান-কয়েক লুচি, বেগুন-ভাজা আর নানারকমের একস্তূপ মিষ্টি এনে দ্বিজেনের সাম্‌নে টেবিলের ওপর রেখে কাকীমা বল্‌লেন, 'এই, মীরা, দ্বিজুর জন্য এক পেয়ালা চা তৈরি করে' আন্ তো। জল চড়িয়ে এসেছি।'

মীরা ঘর থেকে বেরিয়ে যাওয়া মাত্র কাকীমা দরজার কাছে মেঝের ওপর বসে' পড়ে' বল্‌লেন, 'দ্বিজু, তোর সঙ্গে কথা আছে।'

কথাটা যে কী, দ্বিজেনের তা বুঝতে বাকি ছিলো না; তবু সে বল্‌লে 'কী, বলুন্‌।'

'এই, মীরার বিয়ের কথা। আমাদের তো ইচ্ছে নয় যে আর দেরি করি। সাম্‌নের অঘ্রানে না হোক্‌, ফাল্গুনে বিয়ে দিতেই হ'বে। এ-বছর না হ'লে আবার তিন বছরের ধাক্কা।'

'কেন?'

'ওর কুষ্ঠিতে এই তিনটে বছর ভালো নয়।'

'তা হ'লে এ-বছরের মধ্যেই বিয়ে দিয়ে দিন্‌।'

'তা তো দিতেই হ'বে। তিন বছর তো আর বসে' থাকা যায় না। মীরা ষোলো ছেড়ে সতেরোয় পা দিতে চল্‌লো।—খাচ্ছিস্‌ না কেন?'

'খাচ্ছি; চা-টা আসুক্‌। নইলে গলায় আট্‌কে যাবে।'

'জল এনে দেবো?' বলে' কাকীমা উঠ্‌তে যাচ্ছিলেন, দ্বিজেন বাধা দিয়ে বল্‌লে, 'না, না, জল লাগ্‌বে না, চা-টা এলে একসঙ্গেই খাবো।'

কাকীমা হঠাৎ জিজ্ঞেস কর্‌লেন, 'ইন্দ্রজিত কী বলে?'

দ্বিজেন এড়ানো জবাব দিলে, 'ইন্দ্রজিত আবার বল্‌বে কী?'

কাকীমা কথাটার ভুল মানে বুঝে' বল্‌লেন, 'ইন্দ্রজিতের মা তো বলেন যে ছেলের মতেই তাঁর মত, ছেলের ইচ্ছেতেই তাঁর ইচ্ছে। অবিশ্যি তিনি নিজে এসেও মেয়েকে দেখে পছন্দ করে' গেছেন।'

এ-আলোচনায় দ্বিজেনের একটুও উৎসাহ লাগ্‌ছিলো না। অথচ, একটু আগেও তা'র উৎসাহের অভাব ছিলো না; এ-বিষয়ে আলাপ

কর্‌তেই তা'র এ-বাড়িতে আসা। কাকীমার সঙ্গে তো বটেই; সম্ভব হ'লে, মীরার সঙ্গে। ফোটো-হাতে মীরাকে দেখার পর আর আলাপ কর্‌বার কিছু ছিলো না; তখন দ্বিজেনের ইচ্ছে হয়েছিলো, এক্ষুনি ইন্দ্রজিতকে কানে ধরে' হিড়্‌হিড়্‌ করে' টেনে নিয়ে এসে মীরার সঙ্গে বিয়ে দিয়ে দ্যায়। ইন্দ্রজিতের কী অধিকার আছে মেয়েটাকে এই রকম tantalize কর্‌বার? এদিকে বিয়ের আশা দিয়েও ঘুরে' বেড়াচ্ছে যত সব অকথ্য মেয়েদের সঙ্গে—ইস্কুল-মাষ্টার্‌নী আর হোয়াট্‌-নট; কোন্‌দিন হয়-তো এক স্বদেশী বক্তৃতা-দেনে-ওলা মেয়েই ওকে পাক্‌ড়ে বস্‌বে। Damn him, the idiot!…কিন্তু একটু পরেই তা'র সব উৎসাহ দপ্‌ করে' নিবে' গেলো; নিজকে তা'র অত্যন্ত দূর, নিঃসম্পর্কিত, একা মনে হ'তে লাগ্‌লো;—মীরা আর ইন্দ্রজিত আর কাকীমা—কে এরা? এরা বিয়ে করুক্‌ বা না করুক বা গোল্লায় যাক্‌—দ্বিজেনের তা'তে কী? খাবারের পেলেটের সাম্‌নে বসে' তা'র অস্বস্তি বোধ হ'তে লাগ্‌লো। পালাতে পার্‌লে বাঁচে—কিন্তু এ-গুলো না খেয়ে তো যাবারো উপায় নেই। কাকীমার কথা সে ভালো করে' শুন্‌ছিলোও না। সে যদি এখন ঈশান আর সিতাংশুর সঙ্গে বসে' গল্প কর্‌তে পার্‌তো! পারিবারিক জীবনের যথেষ্ট হয়েছে। কাকীমার কথার ওপর সে ক্ষীণস্বরে বল্‌লে, 'তা হ'লে আর কী?'

'কিন্তু মা-র পছন্দ দিয়ে কী হ'বে? আজকালকার দিনে—'

দ্বিজেন তাড়াতাড়ি বল্‌লে, 'ইন্দ্রজিত তো মীরাকে বিয়ে কর্‌তেই চায়।'

'আমরাও তো তা-ই জানি। তা হ'লে অঘ্রান মাসেই একটা দিন ঠিক করে' ফেলা যাক্—কী বলিস্?'

'ভালোই হয় তা হ'লে।'

'এত তাড়াতাড়িতে ছেলের কোনো আপত্তি হ'বে না তো?'

'বিয়েই যদি করে, তা হ'লে আর দু'চার মাস আগে-পিছে হ'লে কী আসে যায়?'

'বিয়েই যদি করে!' কাকীমা শঙ্কিত হ'য়ে উঠ্‌লেন, 'বলিস্ কী? না-ও করতে পারে নাকি?'

নাঃ, আর পারা যায় না। নেহাৎই একটু বৈচিত্র্য আন্‌বার জন্য দ্বিজেন একটু মিষ্টি ভেঙে মুখে দিলে। বল্‌লে, 'না, তা তো মনে হয় না।'—বল্‌তে-বল্‌তে সে মুখ নীচু করে' হাসি লুকোলে—'আর, বিয়ে করলে মীরাকেই করবে; ও নিজেই তা বলেছে।'

'বলেছে?' কাকীমার মুখ উজ্জ্বল হ'য়ে উঠ্‌লো, 'সত্যি? তা হ'লে তুই একটু বলে' ছাখ্ না, এই অঘ্রানেই—'

'বল্‌বো।'

'তোরা বন্ধুমানুষ, তোরা বল্‌লে—'

'ইন্দ্রজিত মীরাকেই বিয়ে করবে। করবে, করবে।' দ্বিজেন মরীয়া হ'য়ে বলে' ফেল্‌লো।

চায়ের পেয়ালা নিয়ে দরজার কাছে এসে মীরা শুন্‌লো এই কথা। আর, তা'র হাত কেঁপে গিয়ে খানিকটা চা উছলে পড়্‌লো পিরিচে। একটু থেমে সে নিজকে তৈরি করে' নিলো; তারপর পিরিচের চা-টা ঢেলে ফেলে' ঘরে গিয়ে ঢুকলো।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

'আমার ষোলো থেকে বাইশ বছরের মধ্যে'—স্থলতা তা'র ডায়েরিতে লিখ্‌ছিলো—'মা-বাবা চার বার আমার বিয়ে দেয়ার চেষ্টা করেন আর চার বারই আমি ফিরিয়ে দিই। এ নিয়ে তাঁদের সঙ্গে আমার অনেক কথা-কাটাকাটি মন-কষাকষি ঝগ্‌ড়া-ঝাঁটি পর্য্যন্ত হ'য়ে গেছে কিন্তু আমি ঘাব্‌ড়াই নি বা ভয় পাই নি বা নিজকে bullied হ'তে দিই নি। আমি আমার নিজের স্বাধীন জীবন চেয়েছিলাম—সে যদি দুঃখের জীবনও হয় তবু সে-ই আমার ভালো তা'তেই আমার পছন্দ। তাঁরা দিতেন বাধা—তাঁদের চোখে যা ভালো দেখায় না তা গ্রহণ করা না হোক্ সহ্য করার মত উদারতাও তাঁদের মনে নেই। কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত আমারি জয় হ'লো—বি-এ পাশ করে' মাষ্টারি নিয়ে আমি কল্‌কাতায় চলে' এলাম—আমার নিজের জীবনের সূত্রপাত কর্‌তে পার্‌লাম। খাওয়া-পরা বাবদ তাঁদের অধীন যদ্দিন ছিলাম তাঁরা জোর খাটাতে পার্‌তেন কিন্তু একবার যখন নিজের পায়ে দাঁড়ানো গেলো তখন আর আমাকে পায় কে? আমার চাক্‌রি নেয়ায় তাঁদের আত্ম-সম্মানে ঘা লাগ্‌লো—লাগুক্। অমন ঠুন্‌কো আত্ম-সম্মানের শিরদাঁড়া ভেঙে যাওয়াই ভালো। তাঁদের সঙ্গে সম্পর্ক উভয় পক্ষের সম্মতিতেই আস্তে-আস্তে ঘুচ্‌তে লাগ্‌লো—চিঠি-পত্রের সংখ্যাও কমে' এলো। বছরে দু'একবার দেখা শোনা না হ'লে সাধারণ ভদ্রতা বজায় থাকে না—তাই ইচ্ছে না থাক্‌লেও যেতে হয়—কী কেমন আছো? এবার খুব বৃষ্টি হ'লো গোছের আলাপ। এক হিসেবে মন্দ নয়। অপ্রিয় জিনিষগুলো

ভেতরেই চাপা পড়ে' থাকে। মনের কথা মনেই থাক্—মুখে মিষ্টি আলাপ কর্‌তে না পারি ভদ্র আলাপ কর্‌তে দোষ নেই, মেজাজ ঠাণ্ডা রাখতে দোষ নেই। যাক্—এতদিনে তবু তাঁদের সঙ্গে একটা মীমাংসায় আসা গেছে এখন আর কোনো হাঙাম নেই। তাঁরা আমাকে চান্ না—আমার জীবনেও তাঁদের কোনো দরকার নেই। আচ্ছা হ্যায়।

'কিন্তু এক-এক সময় মন খারাপ হয়। মনে হয় তাঁদের সহানুভূতি যদি পেতুম তাঁরা যদি আনন্দের সহিত আমাকে গ্রহণ কর্‌তেন, আমাকে এমন আলাদা না ভেবে তাঁদের একজন বলে'ই মেনে নিতেন তা হ'লে হয়-তো জীবনের একটা মানে খুঁজে' পেতাম। বর্ত্তমানে আমার এই অস্তিত্বের কোনো মানে খুঁজে' পাচ্ছি নে—অন্তত এক-একটা সময় আসে যখন তা-ই মনে হয়। স্বাধীন হয়েছি তা ঠিক, সুখেও যে নেই তা নয়, রোজগারে ভাগ বসাবার কেউ নেই বলে' কোনোরকম অভাব হয় না—তবু এক-এক সময় মনে হয় কিছুরি কোনো মানে হয় না, কিসের জন্যই বা এই ড্রাজারি কর্‌ছি বেঁচেই বা কী লাভ হচ্ছে। এই ইস্কুল-টিচারি জীবনের বৈচিত্র্যহীন একঘেয়েমি অসহ্য হ'য়ে ওঠে। একই কাজ কলের মত রোজ করে' যাও—ঘণ্টার পর ঘণ্টা—ডেড্-টায়ার্ড্ হ'য়ে ফিরে' এসে—তখনই বা কী? কোনো ফূর্ত্তি নেই, আড্ডা নেই—চুপ-চাপ নিরীহ ভালোমানুষের মত দিন কাটিয়ে দাও। এ ভাবে বেশি-দিন চল্‌লে বুড়িয়ে যেতে কতক্ষণ! তিন বছরেই মনে হচ্ছে খুব হয়েছে আর নয়। কিন্তু এখন আর ফের্‌বার পথও দেখ্‌ছি নে—ইস্কুলমাষ্টারি ছাড়া বিয়ে-না-করা বাঙালী মেয়ের আর কী career আছে? এবং বিয়েটা বাঙালী মেয়ের career নয় barrier—কিম্বা আরো ভালো—

burial। যদি অন্য-কোনো পথ থাক্‌তো! আমি যদি লিখ্‌তে পার্‌তাম বা ছবি আঁকতে বা ভালো গান কর্‌তে—যদি journalismএ ঢুক্‌তে পার্‌তাম বা কোনো বড়লোক সাহিত্যিক যদি আমাকে সেক্রেটারি রাখ্‌তেন। সাহিত্যই আমার সব চেয়ে পছন্দ—যারা বই লিখ্‌তে পারে তাদেরকে আমার এমন হিংসে হয়। আজ যদি আমি লেখ্‌বার ক্ষমতা পাই তা হ'লে অনায়াসে আমার জীবনের দশ বছর দিয়ে দিতে পারি। ঔপন্যাসিক শ্রীযুক্তা স্থলতা দত্ত—how thrilling! আর আর্টের্‌ মত জিনিষ পৃথিবীতে কিছু নেই—আর-কিছুতেই এতটা আসে যায় না, আর্টের কাছে সব তুচ্ছ। আর্ট্‌ মানে সৌন্দর্য্য, সৌন্দর্য্য মানে হার্মনি, হার্মনি মানে আনন্দ। যে-সৌন্দর্য্য উপভোগ কর্‌তেই এত আনন্দ তা সৃষ্টি কর্‌বার আনন্দ না জানি আরো কত বেশি। তা যদি সৃষ্টি কর্‌তে পারি তবে না-হয় পেলামই কষ্ট—নিজকে না-হয় ভুলে'ই থাক্‌লাম—জীবন না-হয় দুঃখেই কাট্‌লো। শার্লট্‌ আর এমিলি ব্রন্টির মত। সে-দুঃখে যে-আনন্দ তা'র তুলনা নেই। তা'র জন্য নিঃসঙ্গতা বিমর্ষতা বৈচিত্র্যহীনতা সব সার্থক। কিন্তু ও-সব জিনিষ মেয়ে-ইস্কুলের একটা টিচারির জন্য সহ্য করা যায় না। কিছুতেই যায় না। কী এগোচ্ছে আমার এতে? এক—মাসের শেষে ক'টা টাকা পাই—এই যা। স্বাধীন হ'য়েও স্বাধীন নয়—অসংখ্য নিয়ম-নিষেধ, ঘড়ি-ধরা কাজ, চলা-ফেরার জায়গা নেই, দম আট্‌কে আসে, চারদিক থেকে সব চেপে ধরে' আছে। নিজকে ফুটিয়ে তোল্‌বার উপায় নেই। বেঁচে আছি—এ পর্য্যন্ত, খাই দাই ঘুমোই, হার্ট্‌ চলে নিঃশ্বাস পড়ে—কিন্তু নিজের ইচ্ছেয় জেনে-শুনে' বাছ-বিচার করে' সত্যি-সত্যি বেঁচে

থাকা—জীবন উপভোগ করা—তা হবার নয়। আমি যদি বুঝ্‌তাম যে আমাকে দিয়ে বই লেখা হ'বে তা হ'লে আমি এক্ষুনি এ-চাক্‌রি ছেড়ে দিতাম—সাহস করে' লেগে থাক্‌লে একটা-কিছু হ'তোই। সেটাই হ'তো সত্যিকারের স্বাধীনতা, যা ছাড়া কোনো আনন্দ নেই। রাত জেগে-জেগে দারুণ গরজে লেখা—পেটের দায়ে লেখা—না লিখ্‌লে উপোস কর্‌তে হবে সেই ভয়ে, সেই সুখে লেখা। কখনো সচ্ছলতা—দিন কয়েক খুব উৎসব—আবার টানাটানি, তখন রুটির সঙ্গে মাখন নেই, কোল্ড ক্রীমের বদলে গ্লিস্‌রিন। না-হয় আরো বেশি—চা-র সঙ্গে খাবার কিছু নেই—তাও যদি হয়, হোক্ না। তখন বন্ধুদের কাছ থেকে ধার করো, ফেরিওলার কাছে পুরোনো শাড়ি বেচো, পুরোনো বইয়ের দোকানে নোগুচি বাঁধা রেখে বিস্কটের টিন কেনো—দিন চলে' গেলেই হয়, মনে আনন্দ থাক্‌লে কিছুতেই কিছু আসে যায় না। অনেক সাহিত্যিক ও আর্টিস্‌টিক বন্ধু-বান্ধব—নানা বিষয়ে গল্প-গুজব, অজস্র আলাপ, হৈ-চৈ, রাত একটা অবধি সান্ধ্য আড্ডা, অনেক জায়গায় যাওয়া, অনেক জিনিষ দেখা, রোজ নতুন অভিজ্ঞতা, রোজ একট-একটু করে' বড় হওয়া—এই হচ্ছে সত্যিকারের জীবন। এই রকম চুপ করে' অদৃশ্য হ'য়ে একা পড়ে থাকা নয়—

'একা—"the very word is like a bell to toll me back—" ইত্যাদি। (বাকিটা মনে পড়্‌ছে না) সাহিত্যিক জীবনের স্বপ্ন থেকে ঠাস্ করে' মাটিতে নেবে এলাম—সেখানে আমি একা। পৃথিবীতে কাউকে আমি আপন মনে কর্‌তে পারি নে—মনের কথা খুলে' বল্‌তে পারি এমন একজন লোক নেই। আমার জন্ম যাদের সঙ্গে

আমাকে বেঁধে দিয়েছিলো তাদের কাছ থেকেও তো খসে' চলে' এলাম। আর এ-ভাঙানি কখনো জোড়া লাগানো যাবে বলে' মনে হয় না। আমার পরিবারের সঙ্গে আমার আর মিশ খাবে না। এবার নারাণগঞ্জ গিয়ে আমার এ-বিশ্বাস আরো দৃঢ় হয়েছে। মা-র খুব অসুখ শুনে' আমি গিয়েছিলাম—নিজের গরজেই গিয়েছিলাম—তাঁরা লেখেন নি, যদি না এসে তাঁদেরকে অপমান করি এই ভয়ে। গিয়ে দেখি মা ভালো—মানে সেরে না উঠ্‌লেও বিপদ আর নেই। আমাকে দেখে অবাকই হলেন সবাই। আমি যেন একেবারে আলাদা—অন্য সমাজের অন্য দেশের কেউ—আমার দয়ায় তাঁরা মুগ্ধ। তাঁরা আমার সঙ্গে যে-অতিরিক্ত ভদ্রব্যবহার কর্‌লেন তাতেই প্রমাণ পেলাম যে তারা আমাকে পর মনে করেন। সেই জন্যেই হাতে ছুটী থাকা সত্ত্বেও দেড় দিন থেকে চলে' এলাম।—'শেষের কথাটা লিখে' সুলতা হঠাৎ থাম্‌লো। খুব সত্যি কথা লেখা হ'লো কি? সুলতা ফাউণ্টেন পেনের উল্টো দিকটা নীচের ঠোঁটের ওপর চেপে ধরে' একটু ভাব্‌লো। না—নিছক সত্যি নয় বটে; কিন্তু একেবারে মিথ্যেও নয়; আংশিক সত্য, অনেক-খানি সত্য। ধরা যাক্, বাড়ির লোকরা জোর করে' চেপে ধর্‌লে কি তা'র সেদিনই আসা হ'তে পার্‌তো? সে অবিশ্যি নিজেই বলে-ছিলো যে তা'র দু'দিনের মোটে ছুটী, কিন্তু তাঁরা চেষ্টাও তো কর্‌তে পার্‌তেন! তাঁরা প্রথম থেকেই ধরে' নিলেন যে সুলতা যেতে পার্‌লেই বাঁচে।…সুলতা শেষের ক'টা লাইন আবার পড়ে' দেখ্‌লে। না—মোটেও মিথ্যে নয়; ঠিক, ঠিক কথা। ওটা থাক্‌তে পারে—কাটাকুটি কর্‌বার কিছু দরকার নেই, পৃষ্ঠাটা বিশ্রী দেখাবে। বেশ, থাক্ ওটা।

মুখ নীচু করে' সুলতা আবার লিখ্‌তে আরম্ভ করলে': 'সাম্‌নে পূজোর ছুটী—কিন্তু তাঁরা জিজ্ঞেস করলেন না আমি আস্‌বো কিনা—কেননা সে-কথা ওঠেই না, আমি যে আস্‌বো না তা তো জানা কথাই। আস্‌তে একবার বল্‌লেনও না আমাকে—বল্‌তে সাহস পেলেন না মনে হ'লো। না পেলেন সাহস—সুলতাও আর শীগ্‌গির তাঁদের ওপর অনুগ্রহ করছে না। পূজোর ছুটীটা তাই কল্‌কাতাতেই কাটাতে হচ্ছে—অন্য কোথাও যাবার পয়সা নেই। মালিনীও আছে—ও আছে বলে' রক্ষে। ও আমার সঙ্গে না থাক্‌লে অনেক রকম অসুবিধে হ'তো। প্রথম কথা আলাদা একটা বাড়ি নিতে পারতাম না—আয়ে কুলোতো না। জুটলো মালিনী—দু'জনে ভাগাভাগি করে' এই বাড়ি নেয়া গেছে। তা ছাড়া নানাবিষয়ে ও invaluable—ও-ই হচ্ছে এ বাড়ির হাফিজ—কী করে' যে ও এত কাজ করতে পারে দেখে অবাক হ'য়ে যাই। আমি তো মরে' গেলেও সব ছোটখাটো খুঁটিনাটি ব্যাপারে এত নজর রাখ্‌তে পারতাম না। ও থাকাতে আমি বেঁচে গিয়েছি। ও-সব ছাড়াও—একজন সঙ্গী তো আছে—যখন-তখন যা-তা গল্প করা যায়। মালিনীর সবি ভালো—কিন্তু ওর একটা দোষ এই যে ওর সঙ্গে কোনো আ স ল আলাপ করা যায় না—যেমন আর্ট বা প্রেম বা প্রতিভা। ও-সব কথা তুল্‌লে ও অস্থানে বিশ্রী রকম হেসে ওঠে না-হয় বিশ্রী ফাজ্‌লেমি করে। না-হয় স্ত্রী-পুরুষের সম্পর্ক নিয়ে ওর বায়লজি থেকে এমন-সব কথা বল্‌তে আরম্ভ করে যার কোনো মানে হয় না। প্রেম জিনিষটাকে লেবেরটরিতে চুল-চেরা analysis করে' লেবেল-মারা বোতলে ভাগ-ভাগ করে' পূরে' রাখা হয়েছে—সে নিয়ে আর কোনো

সমস্যাই নেই—ওঁর কথাবার্ত্তা শুন্‌লে তা-ই মনে হয়। বিজ্ঞান সব জায়গাতেই তা'র নোঙ্‌রা নাক ঢোকাতে আসে কেন ভাবি। আর্ট সব চেয়ে বড় সত্য—কারণ আর্ট্ পরীক্ষিত সত্য নয়, অনুভূত সত্য। আইন্‌স্‌টাইন এসে নাকি নিউটনের ফিজিক্সকে উল্‌টিয়ে দিয়েছেন—তিন শো বছর পর আর-একজন এসে হয়-তো রিলেটিভিটিকে উড়িয়ে দেবেন—কিন্তু "হৃদয়পানে হৃদয় টানে, নয়নপানে নয়ন ছোটে"—এ-কথা পৃথিবীর মত পুরোনো। কবিরা চিরকাল তা-ই বলেছেন এবং লোকে চিরকাল তা সত্যি বলে' অনুভব করেছে, এ-কথা কখনো মিথ্যে হবার নয়। কিন্তু মালিনীকে এ-সব কথা বলা বৃথা। ও কিচ্ছু বোঝে না। সাহিত্য-বোধ না থাক্‌লে মানুষ যে সম্পূর্ণ হয় না, মালিনী তা'র উদাহরণ।

'মালিনীর সঙ্গে আমার বন্ধুতা খুব উপভোগ্য হ'লেও হাল্‌কা ধরণের —মনের গভীরতায় তা পেঁছিতে পারে নি। আসলে আমি একা— একেবারে একা। এমন সময় আসে যখন নিজকে নিয়ে কী কর্‌বো ভেবে পাই নে। মন এত নরম হ'য়ে পড়ে যে মনে হয় after all বিয়ে করে' ফেল্‌লেই পার্‌তাম। ভালো মন্দ যা-ই হোক্ একটা point হ'তো। বিয়ে কর্‌বো না বলে' আমার কোনো সাংঘাতিক প্রতিজ্ঞাও নেই—যদি অবিশ্যি সে-রকম লোক পাওয়া যায়। সেটাই একট কঠিন। এ-পর্য্যন্ত অনেক পুরুষ আমার জীবনের ওপর দিয়ে চলে' গেছে—তা'রা অনেকেই আমাকে বিয়ে কর্‌তে রাজি ছিলো। (মালিনী বলে আমি নাকি পাকা ফলের মত—দেখ্‌লেই খেয়ে ফেল্‌তে ইচ্ছে করে।) আমিও যে তা'দেরকে পচ্ছন্দ না কর্‌তাম তা নয়—

দু'একজনকে খুবই কর্‌তাম। কিন্তু তবু যে তা'দের কাউকে বিয়ে করি নি তা'র কারণ মনে-মনে আমার সর্ব্বদা বিশ্বাস ছিলো—"the best is yet ts be।" পরে হয়-তো আরো ভালো আস্‌বে—তাড়াহুড়ো করে' পাছে ঠকে' যাই, এই ভয় আমার মনে সর্ব্বদা ছিলো। তাই তা'দের সবাইকে আমি হাত থেকে ফস্‌কে যেতে দিলাম, কিছুকাল ঘোরাফিরি করে' একজন-একজন করে' তা'রা সবাই বিয়ে কর্‌লে, বৌকে নিয়ে আমার বাড়ি বেড়াতে এলো—ভাবখানা এই—তুমি না-হয় বিয়ে করো নি—বয়ে' গেছে—দেখ্‌ছো তো কী চমৎকার বৌ পেয়েছি। পেয়েছে—ভালো, তা'তে আমার চেয়ে সুখী পৃথিবীতে কেউ হয় নি। আর আমি—আমি না-হয় অপেক্ষাই কর্‌ছি—দেখি কী হয়। "The best is yet to be." ওরা সব বিষয়েই ভালো ছিলো—কিন্তু এত সা ধা র ণ! এমন-কিছু ছিলো না যা'র জন্য ভালোবাসা টেঁকসই হ'তে পারে। একজন লোকের শারীরিক সুখ আর মানসিক স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য নিজকে বিলিয়ে দিতে আমার ইচ্ছে করে না—ভালোবাসার এ বড় ছোট প্রতিদান। আমার ভালোবাসার যদি কোনো মূল্যই থাকবে তা হ'লে তা দিয়ে আমি কোনো প্রতিভাকে আত্মপ্রকাশ কর্‌তে সাহায্য কর্‌বো, কোনো কবির কাব্যের প্রেরণার মূলে থাক্‌বো আমি। আমি—যা'কে দিয়ে সাহিত্যের কিছুই হবার নয়—এই মেয়ের জীবনে এর চেয়ে বড় সৌভাগ্য আর কী হ'তে পারে? আমি—শুধু তা-ই কেন?—যে-কোনো মেয়ের প্রেমের এর চেয়ে বড় সার্থকতা আমি ভেবে পাই নে। আমাকে নির্দ্দয়ভাবে ব্যবহার কর্‌লেও আমার আপত্তি নেই—আমি চাই নে যে

সে আমাকে মাথায় তুলে' রাখ্‌বে। তা'র কাছে তা'র কাজই সব চেয়ে বড়—আমার দিকে তাকাবার তা'র সময় কোথায়? আমি যে তা'র কাজের প্রেরণা জোগাই শুধু এইটুকুই আমার মূল্য—আমি মানুষটা তা'র পক্ষে বাহুল্য। তা-ই হোক্। তা'তে করে' আমার সুখ হ'বে না—সাধারণ ভাষায় যাকে সুখ বলে, তা হ'বে না, সাধারণ সুখ আমি চাইও নে। কোনো-এক প্রতিভার আশ্চর্য্য বিকাশের মূলে থাক্‌বো আমি—এই আনন্দই আমার পক্ষে যথেষ্ট।'

এক দমকে এতখানি লিখে' স্থলতা থাম্‌লো। কলমটা রেখে দিয়ে চেয়ারে হেলান দিয়ে সে একট চোখ বুজ্‌লো। বুজ্‌তেই তা'র মনে পড়লো ইন্দ্রজিত সেনের চেহারা। সে আপত্তি কর্‌লো না—খানিকক্ষণ চল্‌লো তা'র মানসিক বিলাস। একা এক ঘরে নিজকে ভারি নিরাপদ মনে হয়; যা খুসি তা-ই ভাবা যায়, মুখ দেখে সন্দেহ কর্‌বার কেউ নেই। আরামে মিনিটগুলো গড়িয়ে যেতে লাগ্‌লো। তারপর হঠাৎ চোখ খুলে' সে আবার টেবিলের ওপর ঝুঁকে' পড়্‌লো; তা'র লেখ্‌বার খাতার কতগুলো পাতা তাড়াতাড়ি উল্টিয়ে গেলো; তাড়াতাড়িতে বেশি পেছনে এসে গেছে;—আবার সাম্‌নের দিকে কয়েকটা পাতা উল্টিয়ে সে ঠিক জায়গায় এলো। নারাণগঞ্জ থেকে ফিরে' এসে সে এইটে লিখেছিলো। ব্যগ্রভাবে সে পড়ে' যেতে লাগ্‌লো:

'ঐ লোকই যে ইন্দ্রজিত সেন তা জান্‌বার আগেই—তা'কে চোখে দেখেই আমার ধারণা হয়েছিলো যে সে একজন জিনিয়াস। চওড়া কপাল, তীক্ষ্ণ চোখ, ম্লান গম্ভীর মুখ—দেখে মনে হয় অনেকখানি শক্তি

যেন ফেটে বেরোতে চায় চেষ্টা করে' চেপে রাখা হয়েছে। সে-মুখের প্রবল কুশ্রীতায় অবাক হ'য়ে গেলাম। খুব সন্দেহ হ'তে লাগ্‌লো যে এর মধ্যে অনেক অসাধারণ জিনিষ আছে। তারপর নাম যখন শুন্‌লাম মনে হ'লো—থাক্‌বারই কথা। আলাপ যখন হ'লো কোনো সন্দেহই রইলো না।

'আজ্‌কে ইন্দ্রজিত সেনের "প্রেমের কবিতা" আবার পড়্‌লাম—মানুষটির সঙ্গে মিলিয়ে। তাঁর চরিত্রের সঙ্গে কবিতার আশ্চর্য্য মিল। তিনি কথা খুব কম বলেন—হাসেন আরো কম্—সর্ব্বদা তাঁকে একটা বিষাদ ঘিরে' আছে, বিষাদেই যেন তাঁকে মানায়, ভালো দেখায়। তাঁর কবিতা পড়ে'ও মনে হয় তিনি কখনো মস্ত একটা ঘা পেয়েছিলেন—তা এখনো শুকোয় নি। এমন করুণ একটা সুর আছে মনকে যা নাড়া না দিয়েই পারে না। তাঁর মনটা আহত পাখীর মত কবিতার লাইনে-লাইনে ছট্‌ফট্ করে' মর্‌ছে। প্রথম যখন পড়েছিলাম তাঁর কবিতার বিষয়গুলো অত্যন্ত commonplace আর ধরণটা অত্যন্ত matter-of-fact ঠেকেছিলো। কিন্তু এখন তা'র ভেতর হৃদয়ের ব্যাকুলতা দেখ্‌তে পাচ্ছি—যা স্পষ্ট ভাষায় প্রকাশ কর্‌তে সাহস না পেয়ে বা লজ্জা পেয়ে তিনি ঐ matter-of-fact ভাবের আশ্রয় নিয়েছেন। তাঁকে দেখে অত্যন্ত sensitive মনে হয় আর অত্যন্ত shy—প্রথমটায় তো আমার সঙ্গে ভালো করে' আলাপ কর্‌তেই চাইলেন না—বইয়ের পেছনে লুকিয়ে বেড়াতে লাগ্‌লেন। এই ধরণের লোককে দেখাশোনা কর্‌বার জন্য একজন লোক দরকার—যে তাঁর পরিচর্য্যা কর্‌বে, মর্জ্জি বুঝে' চল্‌বে, নির্দ্দয় পৃথিবীর হাত থেকে তাঁকে আগ্‌লে রাখ্‌বে।

পরিপূর্ণ সহানুভূতি না পেলে প্রতিভা ফুট্‌তে পারে না, সেইজন্য—'

টেবিলের ওপর তা'র রিস্‌ট্‌ওয়াচ্‌টি পড়ে' ছিলো; হঠাৎ তা'র ওপর চোখ পড়াতে সুলতা বল্‌তে গেলে লাফিয়ে উঠ্‌লো। এরি মধ্যে আটটা বাজে! ইন্দ্রজিত যে-কোনো মুহূর্ত্তে এসে উপস্থিত হ'তে পারে। অথচ তা'র এখনো সাজই হয় নি! মালিনীটাই বা কোথায়—কী কর্‌ছে সে? সব ঠিকঠাক আছে তো? সে যাক্ গে, পনেরো মিনিটের মধ্যে তা'কে অন্তত তৈরি হ'তে হ'বে। তাড়াতাড়ি সে তা'র ডায়েরি-বই ড্রয়ারে ঢুকিয়ে চাবি লাগিয়ে দিলে।

* * *

খুঁজ্‌তে-খুঁজ্‌তে মালিনীকে পাওয়া গেলো রান্নাঘরে। সুলতা ঘরের ভেতর ঢুক্‌লো না;—উনোনের আঁচে মুখের ক্রীম ঘাম হ'য়ে চামড়ার ওপর ফুটে বেরুতে পারে, আর ইন্দ্রজিতবাবুকে যে-কোনো মুহূর্ত্তে আশা করা যায়। দরজার কাছে দাঁড়িয়ে বল্‌লে, 'তোমাকে আধ ঘণ্টা ধরে' খুঁজে মর্‌ছি; তুমি ওখানে কী কর্‌ছো?'

মালিনী বল্‌লে, 'রান্না।'

'রান্না যে, তা তো দেখ্‌তেই পাচ্ছি; কিন্তু তুমি কেন ও-কাজ কর্‌ছো? ঠাকুর রয়েছে কী কর্‌তে?'

'রান্না কর্‌তে।' বাঁ হাত দিয়ে কপাল থেকে চুল সরিয়ে মালিনী বল্‌লে: 'কিন্তু মাঝে-মাঝে যদি ডিমের চপ্‌ না ভাজ্‌লাম, তা হ'লে আমিই বা আছি কী কর্‌তে? ডিমের চপ্‌ আমার specialty। আমার করা ডিমের চপ্‌ যে একবার খেয়েছে সে আর-কিছু খেতে

চাইবে না। অন্তত—' মালিনী তা'র লুটিয়ে-পড়া আঁচলটাকে কাঁধের ওপর তুলে' দিলে—'ডিমের চপ্ যে আর খেতে চাইবে না, তা ঠিক।'

সুলতা বিরক্ত হ'য়ে বল্‌লে, 'সে যাক্ গে—তুমি এখন বেরিয়ে এসো তো। ইন্দ্রজিতবাবু এক্ষুনি হয়-তো এসে পড়্‌বেন।'

'তা আসুন্ না ; তুমিই তো আছো অভ্যর্থনা কর্‌তে। আমি না-হয় রান্নার একটু দেখাশোনা কর্‌লাম। অবিশ্যি হৃদয়ের মাধুর্য্যই সব, কিন্তু ভদ্রলোককে ostensibly তো খেতেই বলেছো ; খাবার জিনিষগুলো ভালো হ'লে তিনিও দুঃখিত হবেন না, তোমারো তা'তে অপ্রশংসার কোনো কারণ নেই। বল্‌তে পারো, ইন্দ্রজিতবাবু কী-কী জিনিষ খেতে ভালোবাসেন ?'

'আমি কী করে' বল্‌তে পার্‌বো ? এ-কথা কেউ কাউকে জিজ্ঞেস করে নাকি ?'

'না ; তা অবিশ্যি করে না। এটা নিতান্ত বাজে কথা। কোন্ রকম বই আপনার ভালো লাগে—সেটাই হচ্ছে আ স ল কথা।' সুলতার আজ্‌কে মন খুব ভালো ; তাই কথাটা সে গায়ে মাখ্‌লে না। বল্‌লে, 'নাও এখন—বাকিগুলো না-হয় ঠাকুরই কর্‌বে—'

'বাকি আর নেই। আর, ডিমের চপ্ আমি ছাড়া—'

সুলতা ধম্‌কে উঠ্‌লো, 'ফের !'

হাত-টাত ধুয়ে' মালিনী উঠে' এলো। সুলতা—যে-ভাবে লোকে ছোট ছেলেকে কথা বলে, সেইভাবে বল্‌লে, 'রান্নাঘরে এসে কী ছিরিই করেছো চেহারার ! যাও শীগ্‌গির—ভদ্দরলোকের মত হ'য়ে এসো গে।'

মালিনী সুলতার চুল থেকে জুতো অবধি একবার চোখ বুলিয়ে

বল্‌লে, 'তুমি তো in your best—eh ?'—মালিনী হেসে ফেল্‌লো—'খুব একটা লাল শাড়ি পরেছো যা হোক্।'

সুলতা মালিনীর মতামত শোন্‌বার আশায় চুপ করে' রইলো ; কিন্তু মালিনী আর-কিছু বল্‌লে না। সুলতা ভেবেছিলো, মালিনী উচ্ছ্বসিত হ'বে। তা না হোক্, ভালো বল্‌বে। আয়নায় নিজকে অনেকক্ষণ দেখে সে ঠিক করেছিলো যে তা'কে বেশ ভালো দেখাচ্ছে ; এখন মালিনী অনুমোদন কর্‌লেই সে নিশ্চিন্ত হ'তে পার্‌তো। লাল সে সাধারণত পরে না বলেই তা'র এই বিশ্বাসের অভাব। লাল রঙ তা'র পছন্দও হয় না। কিন্তু আজ ইন্দ্রজিত সেনের কবিতার বই পড়্‌তে-পড়্‌তে সে এই দুই লাইন পেয়েছিলো :

নাবিকের ক্লান্ত চোখে দূর সমুদ্রের মত লাল
সেই তা'র শাড়ি যদি মোর চোখে না লাগিতো এসে !

সঙ্গে-সঙ্গে সে মন ঠিক করে' ফেল্‌লো। বাক্স ঘেঁটে একটা লাল রঙের শাড়ি পাওয়াও গেলো। শাড়িটা পুরোনো ; তা হোক্।...

* * *

ধর্ম্মতলা দিয়ে হাঁট্‌তে-হাঁট্‌তে সিতাংশু আর ঈশান ওয়েলেস্‌লি-ওয়েলিংটনের মুখে এসে দাঁড়ালো। ঘড়ির দিকে তাকিয়ে সিতাংশু বল্‌লো, 'দশটা দশ। বাড়ি ফির্‌তে-ফির্‌তে সাড়ে-দশ। খাওয়া—বই—ঘুম। It's a great life.' সিতাংশু দীর্ঘ এক হাই তুলে' তা'র আরামের ভাবটা প্রকাশ কর্‌লে।

'ইন্দ্রজিত নিশ্চয়ই,' সিতাংশু বল্‌লে, 'এখন প্রচুরভাবে আপ্যায়িত হচ্ছে। কিন্তু যা-ই করো না, কেন, মিস্ দত্ত, তোমার কোনো

আশা নেই, কোনো আশাই নেই। ইন্দ্রজিত ললিতা লাবণ্যবতীকে বিয়ে করবেই ; সে তা'র ভাত থেকে মাছি তাড়াবে—'

'আঃ, থামো, সিতাংশু', ঈশান বাধা দিলে, 'আর ভালো লাগে না।'

'রাইট্ !' সিতাংশু হেসে ঈশানের পিঠ চাপড়ালে, 'আর ভালো না-লাগাই উচিত। আমারো আর ভালো লাগ্‌ছিলো না। তুমি সব সময় কী করে' যে আমার মনের কথা বুঝ্‌তে পারো, ভেবে অবাক লাগে। গুড-নাইট্।'

'গুড্-নাইট্।'

সিতাংশুকে নিয়ে বাস্ মোড় ফেরার পর ঈশান দ্রুত পদক্ষেপে পুব-দিকে চল্‌তে লাগ্‌লো। মৌলালির মোড় ছাড়িয়ে লোয়ার সার্কুলার রোডের ওপর একটা ছোট হোটেলের মত ব্যাপার—সেইখেনে সে থাকে। এটুকু পথ সে রোজই হেঁটে সারে—কারণ, হাঁট্‌তে তা'র ভালো লাগে ; একা হাঁট্‌তে খুব ভালো লাগে। কোনো জিনিষ চিন্তা করবার পক্ষে হাঁটার মত এত সাহায্য আর-কিছুই করে না ; পা ফেলার তালে-তালে মগজের প্যাঁচগুলো নিজ থেকেই থেকেই যেন ছাড়িয়ে যেতে থাকে। চিন্তারও একটা ছন্দ আছে ; সেই ছন্দ যখন কেটে যায়, তখনি আমরা বলি, মাথা গুলিয়ে গেছে ; মন তখনি এলো-মেলো হ'য়ে যায়। সেই ছন্দ ফিরিয়ে আন্‌তে পারলেই মনে হয়, মাথা খুলে' গেলো। সেইজন্য দরকার গতি, একটা খুব চওড়া, সহজ তালে চলা, একটা rhythmic আওয়াজ কানে শোনা—তা'তে মনটা আস্তে-আস্তে আবার ঠিক সুরে বাঁধা হ'য়ে যায়। মনের ভেতরের তালের সঙ্গে বাইরের একটা accompaniment থাক্‌লে চিন্তা জমে' ওঠে।

ট্রেইনের চাকার শব্দ, ইষ্টিমারের প্রপেলারের শব্দ, সমুদ্রের, ট্র্যাফিকের, ঘোড়ার খুরের—নিদেনপক্ষে নিজের পায়ের শব্দ—সবি সাহায্য করে। হাঁট্‌বার আর-একটা মস্ত সুবিধে এই যে প্রতিবার পা ফেলার সঙ্গে-সঙ্গে সমস্ত শরীর আন্দোলিত হয়; সেই ম্যুভ্‌মেণ্ট্‌ চিন্তাকে আরো এগিয়ে দেয়; আর চিন্তা যতই এগোয়, পা ফেলাও সঙ্গে-সঙ্গে তাড়াতাড়ি হ'তে থাকে। ঈশান কোনো-না-কোনো বিষয়ে রোজই এমন ব্যাপৃত হ'য়ে থাকে যে সে যে হাঁট্‌ছে, তা সে বুঝ্‌তেই পারে না, হঠাৎ এক সময় দ্যাখে,-হোটেলের দরজায় এসে পড়েছে। সিতাংশুকে নিয়ে একটা উপন্যাস লিখ্‌তেই হ'বে—ঈশান আজ্‌কে ভাবছিলো—ওর ধরণের চরিত্র বাঙ্‌লা সাহিত্যে এখনো আম্‌দানি হয় নি; আধুনিক বাঙ লার 'চিন্তাশীল' যুবকদের তা পছন্দও হ'বে না। হাল্‌কা, শুক্‌নো, ঝর্‌ঝরে, ফুর্‌ফুরে এক যুবক—কোনো চিন্তা-ভাবনা নেই, পয়সা আছে। বড়লোক হ'লেই 'চিন্তাশীল' যুবকরা আপত্তি কর্‌বে—সেটা অস্বাভাবিক—এমন কি, অন্যায়। কেননা, দেশের লোক যখন মর্‌ছে না খেতে পেয়ে, তোমার নায়ক কিনা হাঁকাচ্ছে মোটার, খাচ্ছে বড়-বড় হোটেলে, থিয়েটার দেখ্‌ছে বক্সে বসে', দুই হাতে ওড়াচ্ছে টাকা। এ সত্যি নয়, এ-বইয়ের ইংরিজি তর্জ্জমা হ'লে বিদেশের লোক তা পড়ে' ভাব্‌বে ভারতবর্ষের লোক ইংরেজ আমলে রাম-রাজত্বে বাস কর্‌ছে। কিন্তু অবস্থা যা'দের ভালো নয়, তা'দেরকে নিয়ে কী করে' কোনো গল্প লেখা হ'তে পারে? অন্নবস্ত্রের সংস্থান কর্‌তেই যা'দের সমস্ত দিন যায়; যা'দের জীবনে কোনা অবসর নেই, বিলাসিতা নেই; যা'দের জীবনের একমাত্র উত্তেজনা ও আনন্দ স্ত্রী-সহবাস—তা'রা একটা উপন্যাসের রসদ

কী করে' জোগাবে ? লেখ্‌বার মত তা'দের মধ্যে কী আছে, বা থাক্‌তে পারে ? একটা লোক খেতে না পেয়ে মর্‌ছে, এই ব্যাপার নিয়ে পাতার পর পাতা কান্নাকাটি কর্‌লে পাঠকদের ধৈর্য্য কতক্ষণ থাক্‌বে ? আজকাল এক ধরণের গল্প বাঙ্‌লাদেশে খুব চলেছে ; এক 'শিক্ষিত' যুবক লালদীঘি অঞ্চলের 'পাষাণ-কারা'গুলোতে চাক্‌রির উমেদারি করে' হয়রান্‌ হচ্ছে ; ছেঁড়া চটিজুতোর ফাঁক দিয়ে বিধাতার বিদ্রূপের মত পায়ের আঙুল-গুলো বেরিয়ে থাকে, তবু সে চলে। ঘরে আছে পচা থুথ্‌রো বুড়ো বাপ, আর বিষাদিনী, তবু আনন্দরূপিণী মা, আর লিক্‌লিকে বেতের মত হ্যাংলা কালো-কালো এক গুষ্টি আণ্ডা-বাচ্চা। বিশাল দুঃখে যুবকের মন হাবুডুবু খায় ; কেরোসিনের কুপি জ্বেলে সে ইয়েট্‌স্‌ পড়্‌তে বসে (ধার-করা বই) ; মনে-মনে এইচ, জি, ওয়েল্‌সের সঙ্গে আলাপ করে, পৃথিবীময় এক Intellectual Republic প্রতিষ্ঠিত হ'য়ে যায় ; ব্যর্নার্ড্‌ শ খুসি হ'য়ে তা'র গালে দাড়ি ঘষে' দেন্‌। এত দুঃখের মধ্যেও সেই যুবকের আবার এক প্রিয়াও আছে , মস্ত বড়লোকের সুন্দর মেয়ে ; সেই যুবতী অবরুদ্ধ প্রেমের বেদনা সইতে না পেরে থিয়েটার রোড থেকে ডি-সোটো চড়ে' কালিঘাটের এক কাণা গলিতে মুমূর্ষু খোলার ঘরে এসে উপস্থিত হয় ; যুবক তখন তা'র সর্ষের তেল-মাখা উদ্‌লা, চিম্‌সে শরীর নিয়ে স্নান কর্‌তে চলেছে ; যুবতী তা ভ্রূক্ষেপ না করে' কোন্‌ এক অসহ্য আবেগে লুটিয়ে পড়ে তা'র পায়ে ; অন্ধকার খুপ্‌রিতে পড়ে' পচা বাপ চ্যাঁচায়, বিষাদ-প্রতিমা মা রান্নাঘরে গিয়ে রান্না কর্‌বার মত কোনো জিনিষ না দেখে নীরবে পবিত্র অশ্রু বিসর্জ্জন কর্‌ছেন, পিলে-ওলা শিশুগুলো ক্ষিদেয় কাৎরাচ্ছে।...মোটামুটি এ-ই গল্প ; বিভিন্ন

লোকের হাতে একটু রকমফের হয়। একেবারে খাঁটি, নির্জলা রিয়্যালিজ্‌ম্ : ইকনমিক্সে বড়-বড় ডিগ্রি-ওলা 'চিন্তাশীল' সমালোচকরা উচ্ছ্বসিত হ'য়ে ওঠেন। তা উঠুন্; কিন্তু এ-সব গল্প পড়্‌লে ঈশানের মনে পড়ে ফলের দোকানের পাশের একটা নর্দ্দমা; স্তূপীকৃত ফলের খোসার ওপর লাখ-খানেক মোটাসোটা নীল রঙের মাছি ভ্যান্‌ভ্যান্ কর্‌ছে; পচা মিষ্টি গন্ধে বাতাস ভারি। দৃশ্যটা মনে সুখ দেয় না; এবং মনে সুখ-দেয়া ছাড়া সাহিত্যের আর কী উদ্দেশ্য থাক্‌তে পারে? সাহিত্য লেখা হ'বে 'with pleasure and for pleasure'—আর আবার কী? লেখক লিখে' যত সুখ পাবে, আর পাঠকদেরকে যত সুখ দিতে পার্‌বে—ততই তা'র কর্ত্তব্য-সম্পাদন ভালো হ'লো। এর বেশি লোকে কেন চাইবে?—আর কী-ই বা চাইবে? দেশটা একেবারে idea-ridden হ'য়ে যাচ্ছে; বড়-বড়, গাল-ভরা গোলগাল কথা না পেলে কেউ খুসি নয়। ফাজলেমি কেউ পছন্দ করে না; আর pleasure মানেই দেশদ্রোহিতা। মুস্কিলই হয়েছে এদেরকে নিয়ে। অথচ, সত্যি-সত্যি একবেলাও না খেয়ে রয়েছে, এমন লোক ঈশান এ-পর্য্যন্ত একজনও দ্যাখে নি, এমন লোকের কথা সে জানেও না। সে আশে-পাশে যত লোক দেখ্‌ছে, তা'দের অবস্থা অপেক্ষাকৃত ভালো; তা'রা অনেক বাজে খরচ কর্‌তে পারে, এবং করে' থাকে। লিখ্‌তে গেলে এরাই প্রায় বড়লোকের ঘরে গিয়ে পৌঁছয়। আর, বড়লোক যা'রা, তা'রা গরীব না হ'য়ে অবিশ্যি অত্যন্ত অন্যায় করেছে; কিন্তু এটা তো ঠিক যে বেচারারা আছে; মহান দরিদ্রদের মত অতটা জলজ্যান্ত না হ'লেও সমাজের এক কোণে কোনোরকমে টিঁকে' আছে; তা'রা নেহাৎ বাজে

আর খেলো সন্দেহ নেই, কিন্তু তা'রাও তো *real*। এদেরকে নিয়ে লিখলেই সে-বই কেন মিথ্যে বলে' উড়িয়ে দেয়া হ'বে? হোক্ বাজে, খেলো, হাল্‌কা; কিন্তু *real* কেন হ'বে না? হাল্‌কা হাসিখুসি লোক নিয়ে হাল্‌কা হাসিখুসি বই—বাঙ্‌লাদেশে এখন তা'র দরকার হ'য়ে পড়েছে। বাঙালী জীবনে এখন ফাজ্‌লেমি, ফ্রিভলিটির অত্যন্ত দরকার। জীবনে ফ্রিভলিটি না থাক্‌লে স্বাস্থ্য ভালো থাকে না। 'চিন্তাশীল'রা বল্‌বেন, এ-রকম বই 'টিঁক্‌বে' না। না টিঁকুক্। ঈশান অন্তত সে-দুঃখে মরে' যাবে না। ম্যাক্স্ বিয়ারবোম বলেন, এর্ পরের ice-ageএ শেইক্‌স্‌পীয়্যরও লোপ পাবে। আর তা'র খান-কয়েক বই যদি শেইক্‌স্‌পীয়্যরে কয়েক লক্ষ শতাব্দী আগেই লোপ পেয়ে যায় তো যাক্। না টিঁকুক্—না টেঁকাই ভালো। 'Sufficeth unto the day the evil thereof.' আর—পৃথিবীর যত ভালো জিনিষ, সবি মুহূর্ত্তের, কিছুই টিঁকে থাকে না—যেমন রামধনু, সন্ধ্যার সোনালী মেঘ, চুম্বন, ভেয়ামু্র্থ্-এর নেশা।

* * *

টেবিলের ধারে বসে' দ্বিজেন একটা রাইটিং প্যাডে অজস্র আঁকিবুঁকি কেটে যাচ্ছিলো। তা'র মন ভালো লাগ্‌ছিলো না; কাকীমার ওখানে গিয়ে হঠাৎ যে তা'র মেজাজ খারাপ হ'য়ে গেলো, এখনো তা সার্‌লো না। তা'র ইচ্ছে কর্‌ছিলো কারো সঙ্গে বসে' গল্প কর্‌তে। কিন্তু বাঙালী পরিবারের বিশেষত্বই এই যে সব চেয়ে যা'রা নিকট সম্পর্কের, তা'রা কাজ না থাক্‌লে পরস্পরের সঙ্গে বাক্য-বিনিময় করে না। আর—এখন এগারোটা বাজ্‌তে চলেছে, বেরিয়েই বা কোথায় যাবে? সিতাংশুর

বাড়ি অবিশ্যি কাছে—মানে, এক মাইলের মধ্যে ; কিন্তু তেতলার ঘর থেকে চ্যাচামেচি করে' সিতাংশুকে নাবিয়ে আন্‌তে-আন্‌তে গল্প কর্‌বার সব উৎসাহ্ যাবে উবে'। একটা টেলিফোন থাক্‌লে বরং—। বাঙালী জাতটা এতই গরীব—দ্বিজেন ভাবলে—যে যা'দেরকে ভালো অবস্থার লোক বলা যায়, তা'রাও বাড়িতে একটা টেলিফোন রাখতে পারে না।

দ্বিজেনের হাতে কলমটা নিরুদ্দেশ চলাফেরায় যেন ক্লান্ত হ'য়ে থেমে গেলো। কলম রেখে দিয়ে দ্বিজেন উঠে' জানালার ধারে গিয়ে একটু দাঁড়ালো। তা'র জানালা দিয়ে অনেকটা আকাশ দেখা যায় ; যখন আর-কোনো কাজ না থাকে, সে আকাশ দেখে সময় কাটায়। আকাশের চেহারা এত ঘন-ঘন বদ্‌লায় যে তা লক্ষ্য কর্‌তে তা'র ভারি মজা লাগে। কিন্তু এখনকার আকাশের চেহারা তা'র একটুও পছন্দ হ'লো না ; শাদা-শাদা ভূতুড়ে মেঘে আকাশের মুখ লেপা-পোঁচা ; তারাগুলো যেন সব চ্যাপ্টা হ'য়ে ছড়িয়ে গেছে। ক'দিন ধরে' বেশ একটু ঠাণ্ডা পড়ে' আস্‌ছিলো—আজ্‌কে আবার গরম, মেঘের জন্য। বিরক্ত হ'য়ে দ্বিজেন জানালা থেকে সরে' এলো। এখনো একটুও ঘুম পায় নি ; চেষ্টা করে' ঘুমোতে গেলেই নির্ঘাত ইন্‌সম্‌নিয়া হ'বে, একটা বই-টই কিছু পড়্‌তে পার্‌লে হ'তো। কিন্তু কী পড়া যায় ? এ-রকম বেসুরো মন নিয়ে উপন্যাস পড়া যায় না, কবিতা তো নয়ই। এমন-একটা জিনিষ দরকার, যা সাঁড়াশির মত মনকে আঁকৃড়ে ধর্‌বে। Differential Calculus-এর কোনো বই থাক্‌লে চেষ্টা করা যেতো। তা যখন নেই···। দ্বিজেন শেল্‌ফ থেকে নতুন ইক্‌নমিক জ্যর্নালটা তুলে' নিয়ে একটা পেন্সিলের জন্য ড্রয়ার খুল্‌লে—ইজি-চেয়ারে শুয়ে' খানিকক্ষণ মস্তিষ্ক-চর্চ্চা করা

যাক্। কিন্তু ড্রয়ার টান্‌তেই সবার ওপরে দেখা গেলো এক চিঠি—চেহারা দেখে নতুন বলে' মনে হ'লো। হাতে তুলে' নিয়ে দেখ্‌লো, তা-ই। বড়, শাদা একটা খাম ; হাতের লেখাটা ঠিক চেনা মনে হ'লো না, মেয়ের না পুরুষের, তা-ও দেখে বোঝা মুস্কিল। দ্বিজেন ডাকঘরের ছাপ দেখ্‌লে—এল্‌গিন রোড। এল্‌গিন রোড অঞ্চল থেকে কে তা'কে চিঠি লিখ্‌তে পারে ? উল্টো পিঠে তা'র নিজের ডাকঘরের ছাপ দেখ্‌লো ; সাড়ে চারটে। বিকেলে সে বেরিয়ে যাবার পর চিঠি এসেছে; কেউ তা'র ড্রয়ারে রেখে দিয়ে পরে তা'কে বল্‌তে ভুলে' গেছে। ইকনমিক জ্যর্নাল টেবিলের ওপর রেখে দিয়ে সে চিঠি খুল্‌লে ; খুলে' পড়্‌লো :

'কল্‌কাতা বড় শহর ; তাই এমনো হ'তে পারে যে দু'জন চেনা লোক সেখানে কিছুকাল বাস কর্‌লো, কিন্তু পরস্পরের অস্তিত্বের কথা জান্‌লো না। কিন্তু কল্‌কাতা এত বড় শহর নয় যে তা'রা সেখানে অনেকদিন কাটালেও তা'দের দেখাশোনা হ'বে না। বল্‌তে গেলে, পৃথিবীটাই খুব ছোট জায়গা; তাই ছাড়াছাড়ি হ'য়েও ঘুরে-ফিরে' আবার দেখা হয়।...'

দ্বিজেন আর কৌতূহল সাম্‌লাতে না পেরে তাড়াতাড়ি পৃষ্ঠা উল্টিয়ে বড়-বড় অক্ষরে নাম-সই দেখ্‌লে : মালিনী রায়। মালিনী রায় ; মালিনী ; মালিনী। নামটা বিশ্বাস কর্‌বার আগে তা'কে দু'তিনবার উচ্চারণ কর্‌তে হ'লো। তা'র হাতের মুঠি হঠাৎ এত দুর্ব্বল হ'য়ে গেলো যে চিঠিটা খসে' টেবিলের ওপর পড়ে' গেলো। দ্বিজেন চেয়ারে বসে' পড়ে' চিঠিটা তুলে' নিলে ; কিন্তু খানিকক্ষণ আর তা'র চিঠি পড়া হ'লো না।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

গাড়ি দেখে মালিনী তো হেসেই বাঁচে না। একটা ভাঙাচোরা রঙ্-উঠে'-যাওয়া পাঁচ বছরের পুরোনো মডেলের ফোর্ড্: তা'রি স্টিয়ারিং হুইল ধরে' দ্বিজেন যথাসাধ্য কায়দা করে' বসে' আছে। মালিনী জিজ্ঞেস কর্‌লে : 'এ-গাড়ি নিয়ে আস্‌তে লজ্জা কর্‌লো না তোমার ?'

'ঢাকা শহরে মোটার-চড়াটাই একটা ভয়ানক ব্যাপার।' দ্বিজেন হেসে জবাব দিলে, 'কী গাড়ি, কেমন গাড়ি, তা কেউ জিজ্ঞেসও করে না। মোটারেরও যে আবার রকমভেদ আছে, তা-ই অনেকে জানে না। উঠে'ই এসো না তুমি—'দ্বিজেন হাত বাড়িয়ে দরজাটা খুলে' দিলে—'দেখ্‌বে, পক্ষীরাজ ঘোড়ার মত উড়িয়ে নেবে তোমাকে ?'

'কিন্তু এই historical relic জোগাড় কর্‌লে কোত্থেকে, বলো তো ?'

'সে আর জিজ্ঞেস কর্‌ছো কেন ? কত কষ্টে যে এ-ই জোগাড় হয়েছে। মালিক বলেছেন, চালানো শেখ্‌বার পক্ষে এমন গাড়ি আর হয় না। ঠিকই বলেছেন ; কারণ, অ্যাক্সিডেণ্টে গাড়ি চুরমার হ'য়ে গেলেও বিশেষ-কোনো ক্ষতি নেই। এসো না—quick।'

মালিনী উঠে' এসে দ্বিজেনের পাশে বস্‌লো। গাড়ি চল্‌তে সুরু কর্‌বার সঙ্গে-সঙ্গে দ্বিজেন বল্‌লে, 'আজ্‌কের মধ্যেই তোমাকে মোটার-চালানো ব্যাপারটার আদ্ধেক শিখিয়ে দেবো। কিন্তু আগে তোমার মেকানিজম্‌টা জানা দরকার। বলো তো মোটার কী করে' চলে ?'

'পেট্রোলে।'

'ছাইরোলে। ছাই জানো তুমি। পেট্রোল কী করে' ওকে চালায় বলো তো?'

'তা আমি কী করে' বল্‌বো?'

'তবে আমি বুঝিয়ে দিচ্ছি—শোনো'—বোঝাতে-বোঝাতে দ্বিজেন শহর ছাড়িয়ে রম্‌নায় এসে পড়লো। একটু-একটু করে স্পীড বাড়াতে-বাড়াতে রেইস্‌কোর্সের কাছে এসে একেবারে পঁয়তাল্লিশ তুলে' দিলে। বুড়ো গাড়ি হাড়ে-হাড়ে ঠক্‌ঠক করে' কাঁপ্‌তে-লাগ্‌লো—কখন্‌ যে টুক্‌রো-টুক্‌রো হ'য়ে খসে' পড়ে, তা'র ঠিক নেই। জোর হাওয়া এসে লাগছিলো ওদের মুখে; রুদ্ধস্বরে মালিনী বল্‌লে: 'আর বাড়ে না?'

'এর বেশি স্পীড উল্টেদিলে গাড়ি যেতে পারে।'

'কচু ওল্টাবে। দাও না বাড়িয়ে।'

'চুপ করো।'

'কোন্‌টা ধরে' কী কর্‌লে স্পীড বাড়ে বলে' দাও না আমাকে।'

ঝাঁ করে' দ্বিজেন স্পীড কমিয়ে দিলে; বল্‌লে, 'দিচ্ছি; সবি বলে' দিচ্ছি। জায়গাটা বেশ নিরালা আছে; এখানেই তোমার শেখ্‌বার খুব সুবিধে হবে।' যে-রাস্তার ওপর গাড়ি থাম্‌লো তা সোজা বহুদূর চলে' গিয়েছে; লোকজন তো নেইই, দু'পাশে কোনো বাড়িও নেই।—'এই যে, দ্যাখো—কাছে এসো।'

মালিনী দ্বিজেনের গা ঘেঁষে' একাগ্র চোখে তা'র দু'হাতের চলা-ফেরা লক্ষ্য কর্‌তে লাগলো। ফোর্ড সাহেবকে নিয়ে দ্বিজেন নানারূপ

কস্‌রৎ করে' চল্‌লো ; চালিয়ে, থামিয়ে, স্পীড বাড়িয়ে, স্পীড কমিয়ে মোড় ঘুরিয়ে, পেছনে ফিরিয়ে—হেন্‌রি ফোর্ড্‌কে দিয়ে যত কাণ্ড সম্ভব, —সাবি হ'লো। সঙ্গে-সঙ্গে বক্তৃতা। দ্বিজেন উপসংহার কর্‌লে : 'কিছুই নয়। জলভাত। পাঁচ বছরের শিশুও মোটার চালাতে পারে। স্‌টিয়ারিং হুইলের ওপর control দু'দিনেই এসে যায়—আর মোটার-চালানো ব্যাপারে সেটাই আসল। প্রথমটায় অবিশ্যি রাস্তার পাশে একটা গাছ বা টেলিগ্রাফ-পোস্‌ট্‌ দেখ্‌লেই সেটার গায়ে ধাক্কা লাগাতে ইচ্ছে কর্‌বে ; আরো মনে হ'বে, বিধাতা মানুষের হাতের বিষয়ে কার্পণ্য করেছেন ; মোটে দুটো হাত দিয়ে একসঙ্গে এতগুলো কলকব্জা কী করে' ব্যবহার করা যেতে পারে ? কিন্তু অভ্যেস হ'য়ে গেলেই বুঝ্‌তে পার্‌বে, একটা হাতই যথেষ্ট ; অন্য হাত দিয়ে তুমি সিগ্রেট খেতে পারো, ল্যাপ্‌ডগ্‌-এর পিঠ চুল্‌কে দিতে পারো, নিজের মুখে মাঝে-মাঝে পাউডার-পাফ্‌ বুলিয়ে নিতে পারো, পাশের লোকের কোমর জড়িয়ে ধর্‌তে পারো। অবিশ্যি শেষেরটা না করাই ভালো ; কারণ অ্যাক্সিডেণ্ট হ'লে বেচারা পাশের লোকের ঘাড়েই সব দোষ চাপাবে··· ।'

মালিনী এ-সব কথা ভালো করে' শুন্‌ছিলোও না ; দ্বিজেন চুপ করামাত্র বলে' উঠ্‌লো : 'এই, দাও না আমার হাতে একটু হুইলটা। দাও না।'

মালিনীর চালনায় ঘণ্টায় পাঁচ মাইল হিসেবে ফোর্ড্‌-সাহেব চল্‌তে লাগ্‌লেন। খালি, চওড়া, পিচ-ঢালা রাস্তা ; সেখানে মোটার-চালানো ভাত খাওয়ার চেয়েও সোজা মনে হয়। মালিনী চাকাটাকে দু'হাতে

প্রাণপণে আঁকড়ে ধরেছে, তবু তা'র হাত কাঁপ্‌ছে; গাড়িটা এই বাঁ দিকে, এই ডান দিকে—এম্‌নি করে' টল্‌তে-টল্‌তে চলেছে। দ্বিজেন বল্‌তে লাগ্‌লো: 'Steady. *Steady.* Go Straight. *Straight.* হাত ঠিক রাখো।' কিন্তু মালিনী কিছুতেই হাত দুটো সাম্‌লাতে পারে না—কেঁপে তা'রা যাবেই। তবু, মনের সব জোর একত্র করে' সে যথাসাধ্য চেষ্টা কর্‌তে লাগ্‌লো। আস্তে-আস্তে তা'র হাত ঠিক হ'য়েও আস্‌ছিলো; প্রায় আধ-মিনিট গাড়িটা সোজাই চলেছিলো; হঠাৎ তা'দের সাম্‌নে, অনেক দূরে দেখা গেলো সাইকেলের ওপর এক যুবক; সেই দিকে আস্‌ছে। দেখেই মালিনীর মুখ থেকে সব রক্ত অদৃশ্য হ'য়ে গেলো, তা'র নিঃশ্বাস পড়্‌তে লাগ্‌লো জোরে; আর গাড়িটা একই সময়ে রাস্তার প্রস্থ্যটুকুর সব জায়গায় উপস্থিত থাক্‌বার আশ্চর্য্য চেষ্টা কর্‌তে লাগ্‌লো। দ্বিজেন কিছুই না-দেখ্‌বার ভাণ করে' চুপ করে' বসে' রইলো। সাইক্লিস্‌ট্‌ যুবক ইতিমধ্যে অনেক কাছে এসে পড়েছে;—মালিনী তাকিয়ে দেখ্‌লো, সে সোজা তা'র গাড়ির দিকেই আস্‌ছে; টক্কর খাবেই, এই যেন তা'র ইচ্ছে। দ্বিজেনের দিকে সে তাকাতেও পার্‌ছে না, তা'কে কিছু বল্‌বার মত শক্তিও তা'র নেই —গলা শুকিয়ে গেছে; হাত-পা অসাড়—কী কর্‌লে গাড়ি থামে, গাড়িটা at all যে থামানো যায়—এ-সব কথা তা'র একবার মনেও এলো না। চাকাটা সে এত জোরে আঁক্‌ড়ে ধর্‌লে যে হাতের তেলোর মাংসে তা'র নখ বসে' গেলো। তবু গাড়িটা রাস্তার ডান পাশে সরে' গেলো, সাইক্লিস্‌ট্‌ও ঠিক সেখানে—ঠিক গাড়ির বনেটের সাম্‌নে। নীচের ঠোঁট শক্ত করে' কাম্‌ড়ে ধরে' মালিনী চোখ বুজ্‌লো।...

কয়েক সেকেণ্ড' পর দ্বিজেন তা'কে বলছিলো, 'তুমি এত চেষ্টা করে'ও ঐ সাইক্লিস্ট-এর ঘাড়ে পড়্‌তে পার্‌লে না—দেখ্‌লে তো। পারা সম্ভবও নয়; কারণ ওর মত সাইক্লিস্ট্ ইউনিভার্সিটিতে আর নেই; গেলো বছরের স্‌পোর্ট্‌স্-এ ও সাইকেলের সবগুলো ব্যাপারে ফার্স্‌ট্ হয়েছিলো। ভদ্রলোক তোমার অবস্থা দেখে খুব হাস্‌ছিলেন। যাক্, তোমার হ'বে। বেশ pluck আছে তোমার। ন্যার্ভগুলো প্রথমটায় ভারি বিশ্রী ব্যাপার করে। ঘাব্‌ড়ে যেয়ো না—সবারি ও-রকম হয়। তোমার হ'বে। তোমার হ'বে।' দ্বিজেন বার-বার আশ্বাস দিতে লাগ্‌লো।

'হ'বে হ'বে; কিন্তু আজকে আর হ'বে না।'—মালিনী এতক্ষণে কথা বল্‌তে পার্‌লো—'তোমার স্‌টিয়ারিং হুইল তুমিই নাও।—বেশ; এবার একটু চালাও দেখি; হাওয়া খেয়ে বাঁচি।'

দ্বিজেন একবারেই তিরিশ করে দিলে।—'আরো?'

মালিনী মাথা নেড়ে সায় দিলে।

রম্‌নার উত্তর প্রান্তের নির্জ্জন রাস্তাগুলো ভাঙা ফোর্ডে করে' তা'রা চষে' বেড়াতে লাগ্‌লো। আষাঢ় মাসের সন্ধ্যায় পশ্চিমের আকাশ লালে লাল; মেঘগুলোতে আগুনের মত রঙ্ ধরেছে, মিলোতে-মিলোতেও মিলিয়ে যায় না। সেই লাল আকাশের পাশাপাশি এক রাস্তা ধরে' চল্লিশের ওপরে তা'রা যখন চল্‌ছে, দ্বিজেন হঠাৎ বল্‌লে, 'হুইলটা একটু ধরো তো, মালিনী; একটা সিগ্রেট ধরিয়ে নিই।'

ততক্ষণে মালিনীর সাহস অনেক বেড়ে গেছে, বেগের উত্তেজনা ঢুকেছে তা'র রক্তে। কথা না বলে' সে দু'হাত বাড়িয়ে দ্বিজেনের গা

ঘেঁষে' সাম্‌নের দিকে ঝুঁকে' পড়ে' চাকাটা আঁকড়ে ধর্‌লো। গাড়িটা প্রথমটায় একটুখানি বেঁকে গিয়ে তারপর ঠিকমত চল্‌তে লাগ্‌লো।

'রাইট্।' দ্বিজেন বল্‌লে, 'জোরে চালালেই গাড়ি control করা সোজা। পার্‌বে তো?'

'খুব।'

সিগ্রেট ধরাতে দ্বিজেন কিছু সময় নিলে। যে হাওয়া—দেশ্‌লাইর কাঠিগুলো জ্বালানো মাত্র নিবে যায়। ইতিমধ্যে মালিনীর হাতে গাড়ি দিব্যি চল্‌ছে। মালিনীর সাহস আরো বেড়ে গেলো, বল্‌লে, 'থাক্ এখন আমার হাতেই, কোনো মুস্কিল হ'লে তুমি তো আছোই।'

'মুস্কিল কিছুই হ'বে না; তুমি হুইল ধরে' চুপ করে' বসে' থাকো। গাড়ি নিজ থেকেই চল্‌বে। বাস্তবিক,' দ্বিজেন প্রশংসা না করে' পার্‌লে না, 'তোমার pluck আছে। চমৎকার চালাচ্ছো এখন।'

'ডাইনের রাস্তায় যাবো?'

'যাও।' দ্বিজেন যথারীতি তা'র হাত বা'র কর্‌লে, যদিও কাছাকাছি কোনো মানুষ দেখা যাচ্ছিলো না। নিরাপদে মালিনী মোড় ফেরালে। দ্বিজেন হাত-তালি দিয়ে বলে' উঠ্‌লো, 'Wonderful! অবিশ্যি অত স্পীডে কখনো মোড় ফেরাতে নেই। অত্যন্ত risky—'

'Risk না নিলে আর মোটার চালিয়ে সুখ কী?' দ্বিজেনের প্রশংসায় আর নিজের কৃতিত্বে ততক্ষণে মালিনীর মনে নেশা ধরে' গেছে; তা'র মনে হ'তে লাগ্‌লো, গাড়িটাকে নিয়ে সে যা-তা কর্‌তে পারে। হঠাৎ সে বল্‌লে: 'আচ্ছা, দেখি তো এক হাতে পারি কিনা—'

দ্বিজেন উৎসাহ দিলে,'পার্‌বে বই কি।'

মালিনী তা'র ডান হাত চাকা থেকে সরিয়ে এনে দ্বিজেনের হাতের ওপর রাখ্‌লে। হঠাৎ দ্বিজেন এক অদ্ভুত প্রশ্ন জিজ্ঞেস করে' বল্‌লো: 'তুমি আমাকে বিয়ে কর্‌বে?' মালিনী অবাক হ'য়ে মুখ ফিরিয়ে দ্বিজেনের মুখের দিকে তাকাতে গিয়ে শুন্‌লো, সে চীৎকার কর্‌ছে: 'আহা— করো কী! করো কী!' দ্বিজেন হুইলটা ধর্‌তে-ধর্‌তেই গাড়ি বাঁধা পথ ছেড়ে এক ঝোপের ভেতর দিয়ে নির্ব্বিবাদে এক গাছে ঠেকে' থেমে গেলো। দ্বিজেন প্রাণপণে ব্রেইক্ কষে' দিলে; তবু এক ভীষণ ঝাঁকুনি লাগ্‌লো; আর-একটু হ'লেই ওরা ছিট্‌কে বাইরে পড়ে' গিয়েছিলো।

নীরবে খানিকক্ষণ দু'জনে পরস্পরের মুখ চাওয়া-চাওয়ি কর্‌লে। তারপর মালিনী তা'র নাকের নীচে একটা আঙুল রাখ্‌লো। বল্‌লে: 'যাক্, বেঁচে আছি।'

দ্বিজেন বল্‌লে, 'তুমি আমাকে বিয়ে কর্‌বে?'

মালিনী বল্‌লে, 'সে-কথা এখন কেন?' বলে' সে হেসে উঠ্‌লো। দ্বিজেনও সে-হাসিতে যোগ দিলে; কারণ মালিনীর বয়েস তখন আঠারো আর দ্বিজেনের কুড়ি; আর তা'র পর পাঁচ বছর কেটে গেছে।

* * *

আরো অনেক কথা দ্বিজেনের মনে পড়্‌তে লাগ্‌লো, কিন্তু সে-গুলোকে ঠেলে' সরিয়ে দিয়ে সে বাকি চিঠিটা পড়ে' গেলো:

'বল্‌তে গেলে, পৃথিবীটাই খুব ছোট জায়গা; তাই ছাড়াছাড়ি হ'য়েও ঘুরে'-ফিরে' আবার দেখা হয়। তোমার সঙ্গে আমার যেমন হ'লো।

বা হ'বে—কারণ দেখা এখনো হয় নি ; আমি তোমাকে একবার চোখে দেখেছি মাত্র। কয়েকদিন আগে—নিউ এম্পায়ারে। আমার কয়েক রো আগে তুমি বসে' ছিলে—সঙ্গে কয়েকজন বন্ধু ছিলেন। তোমাকে দেখেই ঠিক চিন্‌তে পেরেছিলাম, তবু হঠাৎ গিয়ে একেবারে আলাপ করাটা কেমন-কেমন লাগ্‌লো। তা'র ওপর, তুমি একা ছিলে না। থিয়েটার ভাঙার পর তোমাকে আর খুঁজে' পেলাম না। পরে মনে হ'লো, কথা বল্‌লেই পার্‌তাম। ভুল হ'লেও একবার "I'm sorry" বলারই তো ব্যাপার। আর, যদি ভুল না হয়—না-হওয়াই সম্ভব—তা হ'লে—রোজ তো আর এই রকম দৈবাৎ দেখা হ'বে না! যা-ই হোক্‌, আমাদের ঢাকার বন্ধুদের মধ্যে একজনকে চিঠি লিখে' দিলাম—তা'র জবাব কাল এসেছে। সে-চিঠিতে জান্‌লাম, তোমরা বাড়িসুদ্ধ সবাই অনেকদিন ধরে'ই এখানে আছো, তুমি ইন্‌কাম্‌ ট্যাক্সে চাকরি পেয়েছো—তোমাদের বাড়ির ঠিকানা জান্‌লাম। এত হ্যাঙাম করে' তবে নিশ্চিত হওয়া গেলো যে নিউ এম্পায়ারের সেই ভদ্রলোক তুমিই। আর, তুমি যখন এখানে আছোই, তখন আমার থাকার খবরটাও তোমাকে না জানিয়ে পার্‌লাম না ; তুমি নিশ্চয়ই আমার সঙ্গে দেখা কর্‌তে আস্‌বে? আশা করি প্রায়ই আমাদের দেখাশোনা হ'বে ; nothing like an old friend—কী বলো? আমার ঠিকানা নীচে পাবে : এ-বাড়িতে আছি এক বন্ধুর সঙ্গে—ইস্কুলের টিচার, সুলতা দত্ত নাম।'—'ও—ও,' দ্বিজেন সশব্দে বলে' উঠ্‌লো, 'ও—ও!' এখন তা'র মনে পড়লো, ইন্দ্রজিত কথায়-কথায় সুলতার এক বন্ধুকে উল্লেখ করেছিলো বটে। সে পড়ে' চল্‌লো : 'গেলো বছর বাবা মারা যাওয়ার

পর থেকেই এখানে আছি।'—ভদ্রলোক এরি মধ্যে মারা গেলেন!—'কিছু-একটা করতে হয়, তাই ইউনিভার্সিটিতে অ্যান্‌থ্রপলজি পড়্‌ছি। জিজ্ঞেস করতে পারো, অ্যান্‌থ্রপলজি কেন?'—মোটেও তা জিজ্ঞেস করবো না;—it's just like you—'কিন্তু কেন নয়?'—That's right! After all, why not? 'অবিশ্যি অ্যান্‌থ্রপলজি পড়ে' কী লাভ হবে' জানি নে; তবে অন্য-কিছু পড়্‌লেই বা বেশি কী লাভ হ'তো? ভবিষ্যতে কী করবো, সে-বিষয়ে ধারণা খুব অস্পষ্ট; সে-চিন্তা কদাচিৎ মনে ওঠে। দিন কেটে গেলেই হ'লো—সুখে কেটে গেলেই হ'লো। সুখে যে না কাটছে, তা-ও নয়। তুমি কেমন আছো? যদি মোটার কিনে থাকো, একদিন নিয়ে এসো। চৌরঙ্গী দিয়ে চালিয়ে দেখিয়ে দেবো। সেদিন গ্র্যান্ড্‌ হোটেলের সাম্‌নে ছ'খানা ঝক্‌ঝকে প্রকাণ্ড রোল্‌স্‌ সার বেঁধে দাঁড়িয়ে ছিলো—দেখেই তৃপ্তি। ঐ রকম একখানা গাড়ি চালিয়ে সুখ আছে বটে। শেষটায় বোধ হয় আমাকে তা-ই হ'তে হবে—কোনো রাজা-মহারাজার শোফ্যর—এমন মন্দই বা কী? সে যা-ই হোক্‌, গাড়ি কিনে' থাকো আর নাই থাকো একদিন এসো। যত শীগ্‌গির পারো। ঠিক এই সময়ে তোমাকে দেখে তত খুসি কেউ হ'বে না, যত হ'বে

'মালিনী রায়।'

দ্বিজেন চিঠিটা আর-একবার পড়্‌লো, তারপর কাগজ-কলম নিয়ে জবাব লিখ্‌তে বস্‌লো:

'মালিনী: ঠিকই বলেছো—nothing like an old friend;

না হ'লে তুমিই বা আমার সংস্পর্শে আস্‌বার জন্য এত চেষ্টা কর্‌বে কেন? আর আমিই বা তোমার চিঠি পেয়ে এমন অভিভূত হ'বো কেন? তোমার সঙ্গে আবার দেখা হ'বে—এটা এমন আশ্চর্য্য লাগ্‌ছে; এখনো ভালোমত বিশ্বাস কর্‌তে পার্‌ছি নে। পুরোনো বন্ধুর সঙ্গে অনেকদিন পর দেখা হওয়া অত্যন্ত exciting ব্যাপার। একটু awkwardও বটে; অন্তত, প্রথমটায়। Anyway, it's always a pleasure. তোমার নিমন্ত্রণের জন্য অনেক ধন্যবাদ; তা'তে মনে অনেকটা সাহস পাচ্ছি। অবিশ্যি মোটার গাড়ি এখনো কেনা হয় নি; তবে তোমার জন্যে না-হয় একটা ভাঙা-চোরা ১৯২৫ ফোর্ড কেনা যাবে—যদি নিতান্তই তোমার গাড়ি না হ'লেই নয়। শুন্‌তে পাচ্ছি, ফোর্ড হাঁকানোই latest fashion।

'তুমি কি জানো যে সেদিন নিউ এম্পায়ারে আমার বন্ধুদের মধ্যে একজনের সঙ্গে তোমার আলাপ হয়েছে? ইন্দ্রজিত সেন—আজকে রাত্তিরেই তোমার বন্ধু স্থলতা দত্তর ওখানে ওর নেমন্তন্ন। আশা করি তোমাদের ডিনার-পার্টি ভালোয়-ভালোয় উৎরে গেছে। কাল ওর সঙ্গে দেখা হ'লে ও কোনো কথা বল্‌বার আগে জিজ্ঞেস কর্‌বো: "মালিনীকে তোমার কেমন লাগ্‌লো?" আর ও অবাক হ'য়ে যাবে। Till we meet,

'দ্বিজেন।'

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

'এত দেরি কর্‌লেন কেন? আমাদের তো ভয় হচ্ছিলো আপনি বুঝি আর এলেন না। কে জানে, হয়-তো ভুলে'ই গেলেন। আপনার পক্ষে'—স্নলতা ভুরু তুলে' cute হ'বার চেষ্টা কর্‌লে—'আপনার পক্ষে ভুলে' যাওয়াই স্বাভাবিক।

ইন্দ্রজিত ভাব্‌লে—এমন-কিছু দেরি তা'র হ'তেই পারে না; এখনো ন'টা বাজে নি। তা ছাড়া, চিঠিতে কোনো সময়ের উল্লেখ ছিলো না। কী করে' সে বুঝ্‌বে কোন্‌টা ঠিক সময়? আর, এই যে এসেছে, তাও কত তাড়াহুড়ো করে'! যাক্‌, অভিযোগ করে' স্নলতা যখন আনন্দ পায়, পাক্‌।

এদিকে স্নলতা তা'র কথা বলেই যাচ্ছে; 'আপনি ভুলে' গেলে আমরা মোটেও অবাক হ'তাম না; কারণ কবিরা ঐ রকমই অন্যমনস্ক হয় কিনা। আর, আপনার মধ্যে এমন একটি নির্লিপ্‌—ততা আছে—' স্নলতা হোঁচট খেতে-খেতেও নিজকে সাম্‌লে নিলে।

ইন্দ্রজিত সংক্ষেপে বল্‌লে, 'আমি এন্‌গেইজমেণ্ট করে' কখনো ভুলি নে!'

কিন্তু স্নলতা নাছোড়বান্দা।—'আপনি বল্‌লে হ'বে কী? আপনার চেহারা দেখেই বোঝা যায় যে সাংসারিক বিষয়ে আপনি একেবারে অকর্ম্মণ্য, অসহায়। আপনি নিশ্চয়ই কখনো কোনো দরকারী জিনিষ খুঁজে পান্‌ না? জিনিষ কিন্‌তে গেলে দোকানীরা আপনার কাছ থেকে ডবল দাম নেয় নিশ্চয়ই? আপনি এন্‌গেইজ্‌মেণ্ট করে' না ভুলে' গিয়েই

পারেন না। আর রবীন্দ্রনাথ তো বলেনই যে কথা দেয়া সোজা, কিন্তু কথা রাখাই শক্ত, তাই কথা-রাখাটাই দুর্ব্বলতা।'

ইন্দ্রজিত দীর্ঘশ্বাস ফেল্‌লো। এবং তা-ও স্থলতার নজর এড়ালো না। চট্‌ করে' ইন্দ্রজিতের দিকে একবার তাকিয়ে সে চুপ কর্‌লো। ইন্দ্রজিতকে আজকে খুব বেশি বিষন্ন দেখাচ্ছে—একেবারে মন-মরা, চুপচাপ ; কী হয়েছে তা'র ? কিসের সে-দুঃখ, যা'র জন্মে তা'র মন একেবারে পাথরের মত জমে' গেছে ? সে যদি তা'র মনের একটি কোণ তুলে' স্থলতাকে একবার একটুখানি দেখাতো ! স্থলতা অবিশ্যি বুঝ্‌তে পারে—সবি বুঝ্‌তে পারে ; কিন্তু তবু যদি ইন্দ্রজিত মুহূর্ত্তের জন্যও তা'র খোলস থেকে বেরিয়ে আস্‌তো ! সহানুভূতিতে, স্থলতাও দীর্ঘশ্বাস ফেল্‌লো।

'আপনার জন্মে', ইন্দ্রজিত বল্‌লে, 'একটা বই এনেছি।'

স্থলতা ভেবেছিলো, খানিকক্ষণ মন-খারাপ করে' থাক্‌বে ; কিন্তু এ-কথা শুনে' নিজকে আর সাম্‌লাতে পার্‌লো না।—'কোথায় ? কী বই ? দেখি ?'

ইন্দ্রজিতের চাদরের ভাঁজের আড়াল থেকে বেরিয়ে এলো ব্রাউন পেপারে জড়ানো এক বই ! স্থলতার হাতে সেটা দেবার সময় সে তা'র মেয়ে-মার্কা হাসি না হেসে পার্‌লো না।

তাড়াতাড়ি ব্রাউন পেপারটা টেনে ছিঁড়ে' ফেলে' স্থলতা বলে' উঠ্‌লো : 'বাঃ ! "My life"—'

'পড়েছেন নিশ্চয়ই ?'

'হ্যাঁ, পড়েছি , কিন্তু সে-বইয়ে ছবি-টবি তো ছিলো না !'—

প্রথম ছবিটার দিকে একবার তাকিয়েই 'কী সুন্দর!' সুলতা বললে, 'Divine!'

'মুখটা', ইন্দ্রজিত না বলে' পারলো না, 'খুব সুন্দর নয়। তবে শরীরটা নিখুঁত।'

'Exactly!' সুলতা বললে, 'কুৎসিত মুখ আর সুন্দর শরীর! আনা পাভলোভার মত।'

'পাভলোভা? আমার তো মনে হয় পাভলোভার—'

'ও, পাভলোভা নয়—কারেনিনা; I mean, আনা কারেনিনা—'

ইন্দ্রজিত চুপ করে' রইলো।

'—আপনি তো আবার উপন্যাস পড়েন না; ঠিকই করেন। পড়্বার মত উপন্যাস পৃথিবীতে বেশি নেই। কিন্তু আনা কারেনিনা—marvellous! ও-বই পড়ে' যত আনন্দ পেয়েছিলাম—' সুলতা সঙ্গে-সঙ্গে বইখানা নেড়ে-চেড়ে দেখ্‌ছিলো—'আরো ঢের ছবি রয়েছে, দেখ্‌ছি। পরে ভালো করে' দেখা যাবে। সুলতা টাইট্‌ল্-পেইজ্-এর আগের পাতাগুলো আস্তে-আস্তে ওল্টাতে লাগ্‌লো—ইন্দ্রজিত কী লিখেছে, তা-ই দেখ্‌বার জন্যে। কিন্তু কোথাও কোনো লেখা নেই সুলতা একটু হতাশই হ'লো। লোকে দেখে মনে করবে, কেনা বই। অথচ, তা'র চোখে বইখানার যে বিশেষ একটা মূল্য আছে, তা ইন্দ্রজিত সেনের দেয়া বলে'। সবাই অবাক্ হ'তো: 'ইন্দ্রজিত সেন! যিনি কবিতা লেখেন?' সুলতা শুধু বল্‌তো, 'হুঁ।' সবারি কৌতুহল হ'তো: 'তাঁর সঙ্গে তোমার আলাপ কী করে'?' কিন্তু গায়ে পড়ে' এ-কথা বল্‌বার সুবিধে সব সময় হ'বে না; লেখাটা না-থাকা ভারি অন্যায় হ'য়ে

গেলো। ইন্দ্রজিত ভুলে' গেছে নিশ্চয়ই; মনে করিয়ে দিলে কেমন হয়? না কি, আজকাল কেউ কিছু লেখে না? অনিশ্চিত মনে স্থলতা বইখানা টেবিলের ওপর রেখে দিয়ে ইন্দ্রজিতের কাছে এগিয়ে এলো।—'ধন্যবাদ। আমি খুব খুসি হ'লাম। এমন স্থন্দর বইখানা—তা ছাড়া, আমার favourite বই। এ-রকম wonderful বই আর পড়ি নি। এডিশন্‌টাও চমৎকার। অনেক, অনেক ধন্যবাদ।'—স্থলতা উচ্ছ্বসিত হ'য়ে উঠ্‌লো। হঠাৎ তা'র খেয়াল হ'লো, ইন্দ্রজিত এসে অবধি দাঁড়িয়েই আছে।—'আমিও যেমন! এতক্ষণ শুধু নিজের কথাই বল্‌ছি। আপনাকে বস্‌তে বল্‌বার কথাও—। কিন্তু আপনারো এ অন্যায়; এত ceremonyর ওপর দাঁড়াবার দরকার কী?'

ইন্দ্রজিতের ঠোঁটের ওপর ক্ষীণ একটি হাসি উঠে' এলো। বল্‌লে, 'মোটেও ceremonyর ওপর দাঁড়াচ্ছিলাম না; এম্‌নিই দাঁড়িয়ে ছিলাম। বস্‌ছি।'—ইন্দ্রজিত হাতের কাছে যে-চেয়ারটা পেলো, সেটাতেই বস্‌তে যাচ্ছিলো; স্থলতা তাড়াতাড়ি বাধা দিয়ে বল্‌লে, 'ওখানে নয়, এই সোফাটায় বস্থন।—এই যে।'—কুশানগুলো ওলোট-পালোট হ'য়ে ছিলো; স্থলতা সেগুলো নেড়ে-চেড়ে ঠিকঠাক করে' দিলে। একটা কুশানের নীচ থেকে বেরিয়ে এলো একখানা 'প্রেমের কবিতা'। বইখানা দুপুর থেকেই সেখানে পড়ে' ছিলো; স্থলতা সরাতে ভুলে' গিয়েছিলো, বা যা'তে ভুলে' যেতে পারে সে-ব্যবস্থা করেছিলো, বা নিজকে বিশ্বাস করিয়েছিলো যে সে ভুলে' গেছে। যা-ই হোক্, সেখানেই বস্‌তে হ'লো ইন্দ্রজিতকে। কিন্তু স্থলতা রইলো দাঁড়িয়ে; একটা নীচু গোল টেবিলের গায়ে হেলান দিয়ে ইন্দ্রজিতের মুখোমুখি। এতক্ষণে—

আনন্দে সুলতার হৃদয় লাফিয়ে উঠ্‌লো—এতক্ষণে ইন্দ্রজিতের দৃষ্টি পড়েছে তা'র ওপর। সুলতা দু'হাত দিয়ে টেবিলের ওপর জোরে ভর দিয়ে মাথাটা একটু পেছন দিকে হেলালো; উজ্জ্বল ইলেকট্রিক আলোর নীচে তা'র শরীরের সৌষ্ঠব স্পষ্ট হ'য়ে ফুটে' উঠ্‌লো। সে তা'র মুখের ওপর ইন্দ্রজিতের দৃষ্টি অনুভব কর্‌লে, তা'র ছোট, পাৎলা ঠোঁটে; তা'র থুত্‌নির ওপর, থুত্‌নি ছাড়িয়ে গলা বেয়ে লাল শাড়ি পেরিয়ে তার লাল নাগ্‌রাই পর্য্যন্ত; আবার চট্‌ করে' তা'র কপালের ওপর। 'কী সুন্দর দেখাচ্ছে আপনাকে—charming!' সুলতা নিজের মনে-মনে শুন্‌তে পাচ্ছিলো: কিন্তু ইন্দ্রজিতের সঙ্গে যখন তা'র চোখো-চোখি হ'লো,সেই মুগ্ধহৃদয় কোনো কথাই বল্‌লে না। কী লাজুক!—সুলতা ভাবলে, এটুকু কথা বল্‌বারো সাহস নেই। লাজুক কবিরা একটু হয়ই। লজ্জাই তো মাধুর্য্য। 'গভীর সুরে গভীর কথা শুনিয়ে দিতে তোরে সাহস নাহি পাই।' এক রকমের লোক আছে, যা'রা—যে-কোনো রকমের সাজই করা যাক্‌, প্রশংসায় উচ্ছ্বসিত হ'য়ে উঠ্‌বে। নিছক ফ্ল্যাটারি! অতটা ভালো লাগে না। যাক্‌, লাল শাড়িটায় তা'কে মানিয়েছে, এ-কথা জান্‌তে পেরে সে খুসিই হয়েছে। ইন্দ্রজিতবাবু নিজে লাল রঙ্‌ পছন্দ না কর্‌লে আর ও-লাইন লিখ্‌তেন না; আর আজকে কেন যে সুলতা লাল শাড়ি পরেছে, তা-ও তিনি বুঝ্‌তে পেরেছেন নিশ্চয়ই। কিন্তু এ নিয়ে আলোচনা করা—সত্যি, কী ছেলেমানুষি! কী সব খেলো ব্যাপার নিয়েই যে তা'রা সময় কাটায়। ইন্দ্রজিতবাবু কবি—তাঁর কাছে ও-সব জিনিষের কোনো মানে হয় না। তাঁর কবিতার বিষাদ…সুলতা ফেনিয়ে-ফেনিয়ে নিজের মনের একটা করুণ অবস্থা

করে' ফেল্‌লো। তাকিয়ে দেখ্‌লো, ইন্দ্রজিত তা'র নিজের বইখানা নিয়ে পাতা ওল্টাচ্ছে। 'ওটা দুপুরবেলা শুয়ে'-শুয়ে' পড়্‌ছিলাম —মানে, আবার পড়্‌ছিলাম।' সোফার এক ধারে বসে' স্থলতা বল্‌লে, 'ওখানেই রয়ে' গেছে, দেখ্‌ছি।'

'আপনি খুব কবিতা পড়্‌তে ভালোবাসেন?'

'খুব।' স্থলতা সোৎসাহে বলে' উঠ্‌লো, 'কবিতার একটা মস্ত গুণ এই যে তা শেষ হয় না। বার-বার পড়া যায়। একেবারে in-ex—'

'—haustible। ঠিক। কখনো শেষ হয় না। প্রকাণ্ড ক্রিস্‌মাস্‌-কেইকের মত, না হয় স্মেলিং সল্টের শিশির মত—কী বলেন?'

এ-কথায় হাসা উচিত কিনা, স্থলতা ঠিক বুঝ্‌তে পার্‌লে না। একটু চুপ করে' থেকে বল্‌লে: 'আপনার কবিতাগুলো যে কতবার পড়েছি, তা'র ইয়ত্তা নেই। এত ভালো লাগে কেন, জানেন? আপনার কবিতা sad বলে'। আচ্ছা, এমন চমৎকার melancholy আপনার মধ্যে কী করে' এলো, বল্‌তে পারেন?'

'পারি। আমার লিভার খারাপ বলে'।'

এবার স্থলতা হো-হো করে' হেসে উঠ্‌লো।—'ঠাট্টা নয়—সত্যি আমি অনেকদিন ভেবেছি কেন বিষাদ আমাদের এত ভালো লাগে, কেন "our sweetest songs are those that tell of saddest thought"?'

'বোধ হয় শেলি ও-লাইন লিখে গেছেন বলে'ই।'

স্থলতা আবার হেসে উঠলো। স্থলতা আগেও লক্ষ্য করেছে,

এ-সব কথা উঠলেই ইন্দ্রজিতবাবু ঠাট্টা করতে আরম্ভ করেন; ঠাট্টার আড়ালে আত্ম-রক্ষা করেন। কিছুতেই ধরা দিতে চান্ না; মনের কথা সব গোপন করে' রাখেন! 'ঠাট্টা করে' ওড়াই, সখি, বুকের ব্যথাটাই।' কিন্তু এখনো কি তা'র সঙ্গে তাঁর পরিচয় যথেষ্ট ঘনিষ্ঠ হয় নি। কবে সুলতা আ স ল ইন্দ্রজিত সেনের দেখা পাবে? আসল লোকটিকে বা'র করে' আন্‌বার চেষ্টায় সে বলে' চল্‌লো: 'আমার মনে হয়, পৃথিবীতে এমন লোক নেই; যা'র মনে কোনো গভীর দুঃখ না আছে। না-থাকাই উচিত; কারণ দুঃখ না পেলে মানুষ পার্ফেক্ট্ হয় না। কবিরা যখন সেই দুঃখের কথা বলেন, মন সহানুভূতিতে ভিজে' ওঠে। সেই জন্যই saddest thought দিয়েই sweetest songs তৈরি হয়। আপনার কবিতা—'সুলতা তা'র স্বর একটু নাবিয়ে দিলে—'যখন পড়ি, মনে হয়, আমার নিজের কথা পড়্‌ছি। আমার জীবনেও—'সুলতা হঠাৎ থেমে গেলো। না, এখনো নয়। অতটা আ স ল কথা বল্‌বার মত atmosphere এখনো তৈরি হয় নি। পরে। রাত যখন বাড়্‌বে। না-হয় আর-একদিন। মনে হচ্ছে, ইন্দ্রজিতবাবু এখন in mood নেই।

ইন্দ্রজিত বল্‌লে, 'বলুন্ না। হঠাৎ থেমে গেলেন কেন?'

সুখে সুলতার গাল লাল হ'য়ে উঠ্‌লো।—'থাক্, এখন থাক্, এখন থাক্। অনেক কথা বল্‌তে হয়।'—অন্য কথা পাড়্‌বার জন্যে সে-তাড়াতাড়ি বল্‌লে, 'নিজের বই খুব মন দিয়ে পড়্‌ছেন তো?'

'না—বইটায় ভারি মজার একটা ছাপার ভুল আছে; আপনি সেখানটায় দিয়ে দাগ দিয়ে রেখেছেন, দেখ্‌লাম।'

'কোথায়, দেখি ?'

ইন্দ্রজিত খোলা বইখানা সুলতার হাতে দিলে। সুলতা দেখ্‌লো, দাগ-দেয়া জায়গাটা হচ্ছে সেই দু' লাইন :

নাবিকের ক্লান্ত চোখে দূর সমুদ্রের মত লাল
সেই তা'র শাড়ি যদি মোর চোখে না লাগিতো এসে।

'"নীল"টা ছাপার ভুলে "লাল" হ'য়ে গেছে।' ইন্দ্রজিত বল্‌ছিলো, 'তবে সুখের বিষয়, ভুলটা মারাত্মক নয়। কারণ, দূরের সমুদ্রের রঙ লাল মনে কর্‌বে, এমন ইডিয়ট কেউ নেই। থাক্‌লেও, সে, আশা করি, আমার কবিতা পড়্‌বে না। তা ছাড়া, এর দু'লাইন আগে যখন "চিল" রয়েছে, তখন মিলের জন্যেও—'

সুলতা বল্‌লে, 'ঠিকই। এ-ভুলটা যে-কেউ ধর্‌তে পার্‌বে। আপনি একটু বসুন্—আমি মালিনীকে ডেকে আন্‌ছি।'

বলে' সে তাড়াতাড়ি পাশের ঘরে চলে' গেলো।

* * *

মালিনী বল্‌লে : 'আপনি তো কিছুই খাচ্ছেন না, ইন্দ্রজিতবাবু।'

'Conventional ভদ্রতা কোরো না।' সুলতা মালিনীকে শাসন কর্‌লে।

'আমি এই রকমই খাই।' ইন্দ্রজিত মালিনীর দিকে তাকিয়ে বল্‌লে, 'কিছু মনে কর্‌বেন না।'

'অত কম খেয়ে আপনি বাঁচেন ?'

'অত কম খাই বলে'ই বেঁচে আছি।'

'লিভার ?'

মুহূর্ত্তের জন্ত ইন্দ্রজিতের মুখ উজ্জ্বল হ'য়ে উঠলো।—'রাইট্।'

'তা হ'লে আর আপনাকে কী করে' খেতে বলি? আমার ডিমের চপ্‌গুলো মাঠে মারা গেলো। এই যে, ঠাকুর মাংস নিয়ে এসেছে। একটু খেতে পারেন—স্ট্যু। খুব light। দেবে? আপনি খেতে পারেন, এমন আর-কিছু নেই কিন্তু।'

ইন্দ্রজিত একটু স্ট্যু নিলে।

'ভাগ্যিস এটা ছিলো, নইলে, দেখ্‌ছি, আপনাকে আজ না খেয়েই থাকতে হ'তো। তোমাকে আমি আগেই বলেছিলাম, সুলতা, ইন্দ্রজিত-বাবু কী-কী খেতে ভালোবাসেন, জেনে নাও। তুমি সে-কথা হেসেই উড়িয়ে দিলে। এখন কেমন?'

'কী যে বলো তুমি!' সুলতার স্বরে ইন্‌ডিগ্‌নেশ্‌ন্ প্রকাশ পেলো, 'তা বুঝি কেউ কখনো করে?'

'না; করে না।' মালিনী তৎক্ষণাৎ সায় দিলে, 'সেটা conventional ভদ্রতার বাইরে।—যাক্, আজ্‌কেই আপনাকে কষ্ট দিলাম, ইন্দ্রজিতবাবু; এর পরে যেদিন আপনার নেমন্তন্ন হ'বে, আপনার জন্তে শুক্তো আর মাগুড়? মাছের ঝোলের ব্যবস্থা রাখ্‌বো। Would that suit you?'

'You are very kind'.

সুলতা বল্‌লে: 'খেতে বসে' খাবার বিষয়ে আলাপ করতে নেই, এটুকু টেব্‌ল্-ম্যানার্স্‌'ও কি তোমার জানা নেই, মালিনী?'

'আমি তো ভেবেছিলাম, তুমি ম্যানার্স্‌-ট্যানার্স্‌ পছন্দ করো না।'

স্থলতা বেকায়দায় পড়ে' গিয়ে বল্‌লে, 'চুলোয় যাক্‌ ম্যানার্স্‌। এ-সব কথা আমার ভালো লাগে না।'

আর সত্যি, স্থলতার এ-সব কথা ভালো লাগ্‌ছিলোও না। ইন্দ্রজিত-বাবু যে কী করে' তা সহ্য কর্‌ছিলেন—এমন কি, ইন্টারেস্‌টেড হ'বার ভাব দেখাচ্ছিলেন, তা সে কিছুতেই বুঝে' উঠ্‌তে পার্‌ছিলো না। ইন্দ্রজিতের আহার্য্যের স্বল্পতা দেখে সে মুগ্ধ হ'য়ে গিয়েছিলো। বায়রনও এম্‌নি কম খেতেন। লণ্ডনের সব চেয়ে নামজাদা হস্‌টেস্‌রা বায়রনের উপলক্ষ্যে বিরাট সব ভোজের আয়োজন কর্‌তেন,—যোলো কোর্সের ডিনার; স্কট্‌ল্যাণ্ড্‌ থেকে পাখী, হল্যাণ্ড্‌ থেকে মাছ, স্পেইন থেকে ফল, ফ্রান্স থেকে মদ, ইটালি থেকে মিষ্টি—এম্‌নি সব। টেবিলের দু' ধারে লণ্ডনের সমস্ত 'সোসাইটি' guest of honour-এর জন্য অপেক্ষা কর্‌ছে। এমন সময় গ্রীক দেবতার মত মুখ নিয়ে ঢুক্‌লো ম্লান এক যুবক; এসে খেলো দু'খানা বিস্কুট আর এক গ্লাশ—জল। হস্‌টেসের হার্ট্‌ব্রেক্‌; অতিথিদের দারুণ বিস্ময়। বায়রন কম খেতেন বলে'ই অত বেশি লিখ্‌তে পেরেছেন; আর শেলি তো চা আর শুক্‌নো রুটি ছাড়া কিছু খেতেনই না। বাস্তবিক, খাওয়াটা কী বিশ্রী ব্যাপার, এমন স্থূল! মানুষও যে পশু, তা প্রমাণ করে' ছাড়ে। অথচ, মানুষ আ স লে তো আর পশু নয়। ঈশ্বর তা'কে যা করে' গড়েছিলেন, তা'র কত ওপরে সে উঠে' গেছে—তবু ঐ খাওয়ার ব্যাপারে এসে তা'কে হার মান্‌তে হয়; স্বীকার কর্‌তে হয় তা'র পশুত্ব। বিশ্রী! খাওয়া ব্যাপারটাকে স্থলতা ঘৃণা করে—নেহাৎই না খেলে নয়, তাই খায়। এত সময় নষ্ট! অনেকে আবার খাওয়া নিয়ে কত

হৈ-চৈ করে ; ভালো খাওয়া আর মন্দ খাওয়া—নানা রকমের রান্না, খিদের উদ্রেক করবার জন্যে পাঁচ মাইল হাঁটা—যেন খাওয়ার জন্যেই আমরা বেঁচে আছি। Gross sensuality! বাস্তবিক, সাধারণ মানুষের মধ্যে *fineness*-এর এত অভাব! স্থলতা তো কোনো-রকমে নাকে-মুখে দুটো ভাত গুঁজে' উঠে' আসে—আপদ বিদেয় করতে পারলেই হ'লো। মানুষ যখন আরো সভ্য হ'বে, তখন নিশ্চয়ই এত ঘটা করে' দিনে পাঁচ বার খাওয়া পৃথিবী থেকে উঠে' যাবে : তখন শিশিতে করে' রাসায়ণিক উপায়ে তৈরি এক রকম পিল্ বিক্রি হ'বে ; তা'তে থাকবে যাবতীয় খাদ্যের essence ; রোজ তা'রি একটা খেলে শরীর রক্ষা হ'বে। তখনি মানুষ হ'বে একেবারে পার্ফেক্ট্ ; ছবি, কবিতা, গান ইত্যাদি আসল ব্যাপারে অনেক বেশি সময় দিতে পারবে ; মানুষ-গুলোও হ'বে অনেক বেশি spiritual। আর—spiritই তো সব, শরীরটা medium মাত্র। বেশি খেলে spirit ঘোলাটে হ'য়ে যায়, বুদ্ধি যায় অসাড় হ'য়ে। মালিনীটা এমন বোকা, ইন্দ্রজিতবাবুর লিভারের রসিকতাটাও বুঝতে পারলে না। ইন্দ্রজিতবাবুর সঙ্গে কিন্তু বায়রনের অনেক মিল আছে ; তাঁর চরিত্রেও তেমনি একটা ঔদ্ধত্য, কথাবার্ত্তায় কাঠিন্য, লেখায় বিমর্ষতা। স্থলতা আগে মনে করতো, বুঝি শেলির সঙ্গেই বেশি মেলে। অবিশ্যি শেলির সঙ্গেও অনেক আশ্চর্য্য সাদৃশ্য আছে ; শেলি-বায়রন মিলিয়ে তৈরি হয়েছে ইন্দ্রজিত সেন।···

ঠাকুর কোর্ম্মা নিয়ে আসতেই স্থলতা তাড়াতাড়ি বলে' উঠলো, 'আমাকে নয় ; আমার পেট ভরে' গেছে।'

'সে কী?' মালিনী অবাক হ'য়ে জিজ্ঞেস করলে, 'এরি মধ্যে পেট

ভরে' গেলো তোমার ? আরো যে অনেক জিনিষ রয়েছে ! ও-সব খাবে কে ?'

'তা আমি কী জানি ?'

'তোমার পাতেও যে কত জিনিষ পড়ে' রয়েছে—'

'Don't be a nice old aunt', স্থলতা তীক্ষ্নস্বরে বলে' উঠ্লো, 'খেতে ইচ্ছে না করলেও খেতে হ'বে নাকি ?' স্থলতা পেলেট থেকে হাত সরিয়ে নিয়ে চেয়ারে হেলান দিয়ে বস্‌লো।

মালিনী একবার ইন্দ্রজিতের দিকে তাকিয়ে স্থলতাকে জিজ্ঞেস করলে : 'তোমারো হঠাৎ লিভার হ'লো নাকি ? রোজ তো তুমি এর তিন গুণ খাও।'

কেউ তা'কে মুখের ওপর সেকেলে বল্‌লেও স্থলতা এর চেয়ে বেশি মর্ম্মাহত হ'তে পারতো না। অত্যন্ত বিরক্তভাবে মাথা-ঝাঁকুনি দিয়ে সে বল্‌লে, 'কী বিশ্রী সব ফাজ্‌লেমি করো তুমি—আমি একেবারেই পছন্দ করি নে।'

মালিনী তাড়াতাড়ি বল্‌লে, 'I 'm sorry'।

কারণ, কথাটা স্থলতা বেশ একটু ঝাঁঝের সঙ্গেই বলে' ফেলেছিলো। স্থলতাকে খুব দোষ দেয়াও যায় না ;—একে তো তা'র লাল শাড়িটা অমন অকথ্য একটা কেলেঙ্কারি করলে—তা'র ওপর, খাবার টেবিলে বসে' সারাক্ষণ সে বিশেষ-কোনো কথা বলতে পারে নি ; তা'র মনের মত কোনো কথা ওঠেই নি ; মালিনীই রাজত্ব করেছে। অবিশ্যি সে-দোষ একা মালিনীর নয় ; স্থলতাই প্রথমটায় চুপচাপ ছিলো—লাল শাড়ির ব্যাপারের পর খানিকক্ষণ পর্য্যন্ত সে আর কাব্যচর্চ্চা করবার

উৎসাহ পাচ্ছিলো না। তখন থেকে তা'র মেজাজ খারাপ হ'য়ে আস্‌ছিলো—আর, সবার ওপর, তা'র খাওয়া নিয়ে মালিনীর রসিকতাটা তা'র অসহ্য ঠেক্‌লো। তবু, মালিনী যখন তা'র দুঃখ প্রকাশ কর্‌লে, সে তা'র দিকে একবার হেসে তাকিয়ে বুঝিয়ে দিলে যে ব্যাপার কিছুই নয়। মালিনীর পরণে একটা পাড়ছাড়া ফিকে নীল রঙের শাড়ি—চমৎকার দেখাচ্ছে ওকে। ইস্‌—সুলতা তো সাধারণত নীলই পরে—লাল রঙে হয়-তো তা'কে atrocious দেখাচ্ছে; আর, তা না হ'লেও, ইন্দ্রজিতবাবু নীল রঙ্‌ই সব চেয়ে ভালোবাসেন নিশ্চয়ই। এমন ভুলও মানুষে করে! আর—আজকে, এখন আবার বদ্‌লানোই বা যায় কী করে'?

'কেউ যখন কিছু খাবে না, আমাকে একাই যথাসাধ্য compensate কর্‌তে হ'বে, দেখ্‌ছি।' মালিনী বল্‌লে, 'এতগুলো জিনিষ মিছিমিছি রান্না করা হ'লো! তোমার খিদে নেই, সুলতা, সে-কথা আগে বল্‌লেই পার্‌তে।'

'তুমি যে তিনজন রাক্ষসের মত খাবার তৈরি করাচ্ছো, তা আমি কী করে' জান্‌বো?'

'Indirectly, আমাকে রাক্ষুসী বলা হ'লো। হ'লো না, ইন্দ্রজিতবাবু?'

ইন্দ্রজিত কথা না বলে' হাস্‌লো।

'আচ্ছা ইন্দ্রজিতবাবু', মালিনী বল্‌লে, 'আপনি কোনোরকম এক্সারসাইজ্‌ কর্‌লেই পারেন। লিভার ভালো হ'য়ে যায়।'

'চেষ্টা করে' দেখেছি; পারি নে। বেজায় কষ্ট হয়।'

'অনেক সহজ সিস্টেম্‌ও আছে।'

'যত সোজাই হোক্, আমাকে দিয়ে হ'বে না।'

'না-হয় চেঁচিয়ে খুব হাস্‌তে তো পারেন। সেটাও লিভারের পক্ষে ভালো।',

'তা-ও আমি পারি নে।' ইন্দ্রজিত গম্ভীর হ'য়ে গেলো। তা'র মনে পড়্‌লো সিতাংশুর উচ্চহাসি। বাস্তবিক, সে যদি ও-রকম হাস্‌তে পার্‌তো! তা'র ওপর, পেটের সেই ব্যথাটা আবার···। একটুখানি কী খেয়েছে কি না—খেয়েছে, অম্‌নি ব্যথাটা বেড়ে উঠেছে। এক হোমিয়োপ্যাথ্ ডাক্তারের ওষুধ খেয়ে কিছুদিন ভালো ছিলো; কাল আবার তাঁর কাছে যেতে হ'বে। কী হ্যাঙাম! এ-রকম তুক্‌তাক্ ক'রে' আর ক'দিন চল্‌বে? একটা-কিছু এক্সারসাইজ্ কর্‌লেই তো পারে। এমন আর কী কষ্ট? কিন্তু কম কষ্টও নয়। আর, কষ্ট যতটা নয়, তা'র চেয়ে বিরক্তিকর। ভূতের মত ঘাড়ে চেপে থাকে। ভাব্‌তেই খারাপ। যাক্ গে—লিভারের যা-খুসি-তা-ই হোক্; লিভারের কথা বেশি না-ভাবাই ভালো; ভাব্‌লে পরে আরো মাথায় চড়ে' বসে।···

ওঠ্‌বার আগে জল খেতে গিয়ে গ্লাশ উল্টে সুলতার গায়ে অনেকটা জল গড়িয়ে পড়্‌লো। 'ছি-ছি', সুলতা বলে' উঠ্‌লো, 'কী বিশ্রী কাণ্ড!' মালিনী আশ্বাস দিলে: 'কিছুই বিশ্রী নয়; অমন সবারি হ'য়ে থাকে। যাও না—চট্ ক'রে' শাড়িটা বদ্‌লে এসো।'

কয়েক মিনিট পরে সুলতা যখন ফিরে' এলো, তা'র পরণে মাছরাঙার পাখার মত নীল রঙের শাড়ি; ব্লাউজটা খয়েরি থেকে হল্‌দে

হয়েছে। ইন্দ্রজিত বল্‌লে, 'লাল শাড়িটায় আপনাকে কিন্তু চমৎকার দেখাচ্ছিলো, মিস্ দত্ত। অবিশ্যি এখনো যে খারাপ দেখাচ্ছে, তা নয়, কিন্তু আমি আবার একটু লাল রঙের বেশি পক্ষপাতী।'

*　　　*　　　*

হঠাৎ একটা শব্দে মালিনীর ঘুম ভেঙে গেলো। চোখ মেলে' সে একটু অপেক্ষা কর্‌লে: কোনো সাড়া-শব্দ নেই। মৃদুস্বরে সে একবার ডাক্‌লো, 'সুলতা!' আবার: 'সুলতা। এই সুলতা।' সুলতার বিছানার দিকে তাকিয়ে অন্ধকারে কিছু বুঝ্‌তে পার্‌লে না। মশারি তুলে' মুখ বাড়িয়ে তা'র মনে হ'লো, পাশের খাবার ঘরে যেন আলো জ্বল্‌ছে। খাবার ঘরের দিক থেকেই আবার একটা শব্দ এলো—খুব মৃদু। কিসের শব্দ, মালিনী ঠাওরাতে পার্‌লে না তা'র একটু ভয়-ভয় কর্‌ছিলো, তবু সে বিছানা ছেড়ে উঠে' পা টিপে-টিপে' এগোতে লাগ্‌লো। মাঝখানকার দরজাটা ভেজানো (সাধারণত বন্ধ থাকে); কিন্তু খানিকটা ফাঁক রয়েছে। মালিনী তাকিয়ে দেখ্‌লো, সুলতা একটা টিন সাম্‌নে নিয়ে টেবিলের ধারে বসে' বিস্কুট খাচ্ছে। মালিনী দরজার ধারে একটু অপেক্ষা কর্‌লে—বেচারা তখন কিছু খায় নি; এখন পেট ভরে' খেয়ে নিক্। সুলতার চারখানা খাওয়া হ'বার পর মালিনী আস্তে-আস্তে সে-ঘরে গিয়ে ঢুক্‌লো। তা'কে দেখেই সুলতার মুখ শাদা হ'য়ে গেলো; 'তুমি উঠে' এসেছো কেন?' জিজ্ঞেস কর্‌তে তা'র গলা গেলো কেঁপে।

'হঠাৎ একটা শব্দ শুন্‌লাম; ঘুম ভেঙে গেলো। ভাব্‌লাম,

চোর-টোর বুঝি—। তোমাকে দেখে নিশ্চিন্ত হ'লাম। কিন্তু এত রাত্তিরে তুমি বিস্কুট খাচ্ছো কেন?'

'কিছুতেই ঘুম আস্‌ছিলো না বলে' এক গ্লাশ জল খাবার জন্য উঠে' এসেছিলাম। খালি-খালি জলগুলো বিশ্রী লাগ্‌লো; তাই সঙ্গে একটা বিস্কুট খেলাম।'

'আর-কিছু খাবে? অনেক জিনিষ বেশি হয়েছিলো কিনা—ঠাকুরকে তুলে' রাখ্‌তে বলেছিলাম। এনে দেবো রান্নাঘর থেকে?'

'পাগল!' সুলতা বল্‌লে, 'বিস্কুট খেয়েই পেট ভরে' গেছে।'

'যাক্‌, এতক্ষণে তোমার পেট ভর্‌লো তা হ'লে!' বলে' মালিনী হেসে উঠ্‌লো। সুলতার কানে সে-হাসি রীতিমত অশ্লীল শোনালো।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

দিন কয়েক পরে এক সকালবেলায় স্থলতা বস্‌বার ঘরে বসে' সেদিনকার স্‌টেট্‌স্‌ম্যানের বিজ্ঞাপনগুলো পড়্‌ছিলো, এমন সময় বাইরে বারান্দায় জুতোর শব্দ শুনে' সে বেরিয়ে এলো। এক লম্বা, ফর্সা যুবক তা'কে নমস্কার করে' জিজ্ঞেস কর্‌লে, 'মালিনী রায় এ-বাড়িতে থাকেন?'

'হ্যাঁ।' স্থলতা এই অচেনা ভদ্রলোককে একবার ভালো করে' দেখে নিলে। 'আস্থন্।'

'মালিনী রায়কে যদি একবার দয়া করে'—'

'দিচ্ছি ডেকে। কী নাম বল্‌বো?'

'দ্বিজেন দাশগুপ্ত।'

স্থলতা দ্বিজেনকে ঘরের ভেতর এনে বসিয়ে মালিনীকে খবর দিতে গেলো। হুঁ, এ-ই স্থলতা দত্ত—দ্বিজেন ভাব্‌তে লাগ্‌লো—ইন্দ্রজিতের জীবন যে দুর্ব্বহ করে' তুলেছে। অন্তত, ইন্দ্রজিত তা-ই বলে। কেন, বেশ দেখ্‌তে তো মেয়েটি; পাৎলা, ছোটখাটো; সজীব মুখ-চোখ। ইন্দ্রজিতেরও আবার বাড়াবাড়ি আছে—কিছুই ওর পছন্দ হয় না; কিছুই ওর ভালো লাগে না; সব সময় নাক শিঁটুকে খুঁতখুঁত করে' বেড়াচ্ছে। ও একটা ইডিয়ট; না হ'লে, স্থলতার সম্বন্ধে ও এখনো অমন আলগোছে থাক্‌তো না। ও নিজকে মেয়েদের ভিক্‌টিম বলে' প্রতিপন্ন কর্‌তে চায়; কিন্তু দ্বিজেনের তো মনে হয়, এ-ক্ষেত্রে স্থলতাই ভিক্‌টিম; স্থলতার প্রতিই

সহানুভূতি যাওয়া উচিত। কেননা, সুলতা নিশ্চয়ই ইন্দ্রজিতের প্রতি অনেকখানি ঝুঁকে' পড়েছে, অথচ ইন্দ্রজিতের কাছ থেকে কিছুমাত্র উৎসাহ পাচ্ছে না। তা ইন্দ্রজিতেরই বা দোষ দেয়া যায় কী করে'? বেচারা তা'র অ্যানেমিয়া আর gastric ulcer নিয়েই··· 'হেলো!'

দ্বিজেন তাড়াতাড়ি উঠে' দাঁড়ালো। খানিকক্ষণ দুই পুরোনো বন্ধু মুখোমুখি দাঁড়িয়ে পরস্পরকে দেখ্‌তে লাগ্‌লো; কেউ কোনো কথা বল্‌লে না।

তারপর দ্বিজেন বল্‌লে: 'তুমি অনেক বড় হ'য়ে গেছো, মালিনী। নিউ এম্পায়ারে তোমাকে দেখ্‌লেও আমি চিন্‌তে পার্‌তাম না।' তার-পর মালিনীর চওড়া কব্জির দিকে তাকিয়ে: 'ইচ্ছে কর্‌লে তুমি এরো-প্লেনও চালাতে পার্‌বে।'

"শ্রীযুক্তা মালিনী রায়, প্রথম বাঙালী—airwoman-এর বাঙ্‌লা কী? মন্দ নয় প্রস্‌পেক্‌ট্‌। বোসো।' মালিনী নিজেও বস্‌লো। 'যাক্, তুমি এলে।'

'এলাম তো।'

'ভালো আছো?'

'খারাপ থাকার অভ্যেস আমার নেই। তবে তোমার মত অতটা ভালো আছি, বল্‌তে পারি নে।'

'কেন, দিব্যি চাক্‌রি-বাক্‌রি কর্‌ছো; স্বাধীন, নিশ্চিন্ত। আর কী চাও? অবিশ্যি একটা অভাব তোমার থাক্‌তে পারে।—বিয়ে করো নি তো?'

'না।'

'কেন ?'

'বিয়ে করবার কথা কখনো মনেই ওঠে নি। আমি, সামান্য ব্যক্তি, দ্বিজেন দাশগুপ্ত—আমারো যে আবার বিয়ে হ'তে পারে, এ-কথা ভাবলেই আমার হাসি পায়।'

'তাই নাকি ? আমাকে কিন্তু তুমি একবার বিয়ে করতে চেয়েছিলে।'

'ঠিক সেই মুহূর্তে—সেই ভাঙা গাড়িতে বসে' তোমাকে বিয়ে করে'ও ফেলতে পারতাম ; যদি সম্ভব হ'তো। কিন্তু পরের দিনই নিজের বোকামিতে অনুতাপের সীমা থাকতো না।'

'আবার সেদিন বিকেলেই মনে হ'তো, এর চেয়ে ভালো কাজ তুমি জীবনে করো নি।'

'তা হ'তো।' দ্বিজেন মানলে, 'হ'তো ; কারণ আমাদের মনের নিজস্ব কোনো চরিত্র নেই ; মন বলে' কোনো একটা জিনিষ আছে, তা-ও বলা যায় না। এক-এক সময় এক-একটা মূড এসে মনকে দখল করে : নানারকমের অনেকগুলো মূড নিয়ে আমাদের মন। একটার সঙ্গে একটা মেলে না ; কিন্তু তখনকার মত প্রত্যেকটা মূডই সত্যি।'

'—শুধু তা-ই নয়,' দ্বিজেন একটু থামতেই মালিনী বলতে লাগলো, 'একমাত্র সত্যি। মানে, তখনকার মত। তখনকার মত আমাদের কাছে অন্য-কোনো মূডের অস্তিত্বই নেই। বলা যায়, আমাদের নানা রঙের, নানা রকমের অনেকগুলো মন ; একজন মানুষ আসলে অনেক ; সেই অনেকের প্রত্যেকটিই সে নিজে ; প্রত্যেকটি সমান সত্য। এই বৈচিত্র্য ও জটিলতা যা'র মধ্যে যত বেশি, সে-ই তত পরিপূর্ণ মানুষ।

একটা লোক পাগল হয় কখন্? যখন কোনো বিষয়ে তা'র একটা সাংঘাতিক obsession হ'য়ে যায়; মন যখন একই মুডে আটকে পড়ে' থাকে, অনেকগুলো মন হারিয়ে গিয়ে যখন শুধু একটিতে এসে ঠেকে। একটা লোক ইডিয়ট হয় কিসে? কারণ, তা'র মন একেবারে সহজ, সরল, সব সময় এক; তাই একটা জিনিষ যে একটা জিনিষ নয়, বিভিন্ন অবস্থায় বিভিন্ন জিনিষ, তা সে উপলব্ধি করতে পারে না। একটা লোক মহাপুরুষ হয় কেন? যে-হেতু তা'র মনে কোনো দ্বন্দ্ব নেই; সব বিষয়েই সে চরম সিদ্ধান্তে উপস্থিত হ'য়ে গেছে। এদের মন অনেক নয়, এক; জটিল নয়, সরল; তাই এরা স্বাভাবিক মানুষ নয়;—পাগল, ইডিয়ট বা মহাপুরুষ। এদের জীবন অত্যন্ত অসম্পূর্ণ, সঙ্কীর্ণ আর একঘেয়ে; কারণ, এদের মধ্যে কোনো বিরোধ নেই। বিরোধেই বৈচিত্র্য; বৈচিত্র্যেই পরিপূর্ণতা। স্বাভাবিক, সুস্থ মানুষের মধ্যে বিরোধের অন্ত নেই; তা'র মন আর মত ক্ষণে-ক্ষণে বদ্‌লাচ্ছে। যে-কোনো বিষয়ে "আমার মত এই" বলা মানেই, "এখন আমার মত এই"; কারণ দু'ঘণ্টা পর যে সে-মত উল্টে' যাবে না, তা'র কিছুমাত্র নিশ্চয়তা নেই। "তুমি ভূত বিশ্বাস করো?" "দিনের বেলায় একঘর লোকের মধ্যে বসে' একটুও নয়; কিন্তু অমাবস্যার রাত্তিরে বটগাছের নীচ দিয়ে একা যেতে-যেতে খুব।"—এই প্রচলিত রসিকতায় মানুষের অনৈক্য-ধর্ম্মের কথা বলা হয়েছে। তেম্‌নি "তুমি ঈশ্বরে বিশ্বাস করো?" এ-প্রশ্নের উত্তর হ'তে পারে: "পেট ভরে' খেয়ে উঠে' পান চিবোতে-চিবোতে যখন চোখ জড়িয়ে আসে, তখন খুব; কিন্তু স্টোভ যখন কিছুতেই জ্বলে না, অথচ চায়ের সময় পেরিয়ে আধ ঘণ্টা কেটে যায়—

তখন একেবারেই নয়।” দু'ক্ষেত্রেই, বিশ্বাসটাও খুব আন্তরিক এবং গভীর, অবিশ্বাসটাও তা-ই। আমাদের ভালো-লাগা মন্দ-লাগাগুলোও এম্‌নি। বর্ষার বিকেলে যখন বন্ধু-বান্ধব নিয়ে চা খেতে-খেতে গল্প করি, আকাশের কালো রঙ্‌ দেখে চোখ জুড়োয়, ঠাণ্ডা হাওয়া মিষ্টি লাগে, রাস্তাগুলো হয় ঝক্‌ঝকে কালো; কিন্তু যখন সারা বিকেল একা ঘরে বসে' কাটাতে হয়, নোঙ্‌রা আকাশ দেখে ঘেন্না করে, পচা হাওয়ায় গায়ে জ্বর আসে, স্যাঁৎসেঁতে রাস্তাগুলো দেখ্‌লে রাগ ধরে। গরম দুপুরবেলায় যাকে দেখেই বিরক্তি লাগ্‌লো, সন্ধ্যের পর হাওয়া ছাড়্‌লে তা'কেই ভালোবাস্‌তে ইচ্ছে করে। আর, ভালোবাসা বল্‌তে technically যা বোঝায়, তা-ও মনের অসংখ্য মূডের মধ্যে একটি মাত্র; সব সময় কেউ কাউকে ভালোবাস্‌তে পারে না। কোনো বিশেষ-একটা কারণে সেই মূড এসে পড়ে: যেমন চাঁদের আলো বা কোনো ফুলের গন্ধ বা কোনো গানের সুর। না-হয় কোনো ছবি বা কবিতা বা আকাশের রঙ্‌ বা সন্ধ্যার অন্ধকার। বৃষ্টির, হাওয়ার বা পাতার শব্দ। এম্‌নি অজস্র সব কারণে হঠাৎ ভালোবাসার মূড এসে পড়ে; কিছুতেই নিজকে সাম্‌লানো যায় না। সত্যি বল্‌তে, প্রকৃতিতে এমন জিনিষ খুব কমই আছে, যা এই মূড এনে দিতে সাহায্য না করে। প্রকৃতির কৌশলের অন্ত নেই; কোথাও-না-কোথাও ধরা দিতেই হ'বে। অবস্থা বুঝে'ই ব্যবস্থা হয়েছে; ভালোবাসার মূড খুব বেশি না হ'লে সৃষ্টি যে টেঁকে না।'

'কিন্তু স্ত্রী-পুরুষের সম্পর্কটা', দ্বিজেন বল্‌লে, 'শুধু তো একটা মূডের ব্যাপার নয়। তা হ'লে আর বিয়ে ব্যাপারটা কেন? আকাশে চাঁদ

উঠ্‌লো ; একটি মেয়েকে প্রেম নিবেদন করলাম : সে মুগ্ধ হ'য়ে সে-রাত আমার সঙ্গে কাটালো। পরের দিন সকালে অন্যরকম মুড এলো, তা'কে দিলাম তাড়িয়ে। আবার কুড়ি দিন পর হয়-তো বৃষ্টির শব্দে আবিষ্ট হ'য়ে আর-একজন মেয়েলোক নিয়ে এলাম ; তিন দিন পর তা'কে ছেড়ে পালালাম। এম্‌নি বার-বার, সমস্ত জীবন ভরে'। তা'তে প্রকৃতিদেবীর সৃষ্টিরক্ষার উদ্দেশ্যও সাধিত হ'তো ; বিয়ের অসংখ্য আইন-কানুনের মারপ্যাচ থেকেও আমরা বাঁচতাম।'

মালিনী হেসে উঠ্‌লো।—'বিয়েটা অবিশ্যি একটা লোক-দেখানো অনুষ্ঠান ; স্বাভাবিক যৌন মিলনের সামাজিক অনুমোদন মাত্র ; কিন্তু বিয়ের সবটাই যে convention, তা নয়। পুরুষের polygamous প্রবৃত্তি থেকে সমাজকে বাঁচাবার জন্য বিয়ের প্রয়োজন ছিলো। কিন্তু যে-জিনিসের সূত্রপাত হয় সমাজ-রক্ষার প্রয়োজনে, বহু শতাব্দীর অভ্যেসের সঙ্গে-সঙ্গে পুরুষের মনে সেটা এমন দৃঢ়ভাবে বদ্ধমূল হ'য়ে গেলো যে সেই সামাজিক ব্যবস্থা হ'য়ে উঠ্‌লো প্রকৃতির বিধানের মতই কঠিন। এ ন, বাইরে থেকে দেখ্‌লে চট্‌ করে' মনে হতে পারে যে পুরুষের স্বাভাবিক ঝোঁকই monogamyর দিকে। আর, এ-ও ঠিক যে পুরুষ-মনের পক্ষে এ-ব্যবস্থা উপযোগীই হয়েছে, কারণ, বার-বার স্ত্রী বদ্‌লাতে গেলে যে-সময় ও পরিশ্রম খরচ হয়,একজনকেইরেখে দিয়ে তা গেছে বেঁচে, সেই সময় ও পরিশ্রম পুরুষ লাগিয়েছে অন্য কাজে—তা'রি ফলে বেশি হরিণ মারতে পেরেছে, বেশি শস্য উৎপাদন করতে পেরেছে, বেশি যুদ্ধ করতে পেরেছে, বেশি বই লিখ্‌তে পেরেছে। একবারে একজন মেয়েলোকে কোনো অসুবিধে

নেই—সব কাজই চলে ; মুড হ'লে পরে তা'কেই ভালোবাসা যায়, অন্য সময়—যেটা হচ্ছে বেশির ভাগ সময়—তা'কে স্বচ্ছন্দে ভুলে' থাকা যায়। এতে আরাম অনেক বেশি, হ্যাঙাম কম। এ-ই তো বিয়ে। সব দিক ভেবে দেখ্‌তে গেলে, এ-ব্যবস্থাই সব চেয়ে সুবিধের—মেয়ে-পুরুষ উভয়ের পক্ষে। কারণ, মেয়ের ভালোবাসার স্বাভাবিক ঝোঁক একবারে একজন পুরুষেরই দিকে। তা ছাড়া,সেটাই তা'র পক্ষে সুবিধের, কারণ, এখানে-ওখানে ঘোরাঘুরি করে' বেড়াতে হ'লে তা'র সন্তানদের যথেষ্ট যত্ন করা সম্ভব হয় না। আজকাল সভ্য যুগেও মেয়েদের পক্ষে এ-সমস্যাই সব চেয়ে গুরুতর। আসলে, chastity জিনিষটা সব চেয়ে সুবিধের এবং আরামের ; তাই পৃথিবীতে একনিষ্ঠ স্বামী-স্ত্রীর সংখ্যাই এখনো বেশি। Chaste হওয়াই খুব সোজা ; unchaste হ'বার ঝক্‌মারি এত বেশি যে অনেকের পক্ষেই হ্যাঙাম পোষায় না।'

মালিনী চুপ করে' দ্বিজেনের মত শোন্‌বার জন্যে তা'র মুখের দিকে তাকালো, কিন্তু দ্বিজেন কোনো কথা না বলে' ধরালে এক সিগ্রেট। মালিনীও চুপ করে' রইলো। এত বেশি উৎসাহ নিয়ে এত সব কথা সে না বল্‌লেই পার্‌তো। কবে দ্বিজেন তা'কে বিয়ে কর্‌তে চেয়েছিলো, সেই থেকে কিনা monogamy নিয়ে আলোচনা! ব্যক্তিগত প্রসঙ্গেই তা'র টিঁকে' থাকা উচিত ছিলো—সেটাই ভালো দেখাতো। একটু লজ্জিতভাবে সে বল্‌লে: 'Very glad to meet you. এতক্ষণ বল্‌তে মনে ছিলো না।'

দ্বিজেন বল্‌লে, 'আমিও। Very glad to meet you।'

পরস্পরের দিকে তাকিয়ে তা'রা দু'জনে একসঙ্গে হেসে উঠ্‌লো।

'সুলতার সঙ্গে তোমার আলাপ হয় নি বুঝি?' মালিনীর মনে পড়লো, 'ডেকে আনবো ওকে?' সুলতা এলেই—মালিনী ভেবে খুসি হ'লো—কথাবার্ত্তার ধরণ একেবারে বদ্‌লে যাবে।

কিন্তু সে-প্রশ্নের কোনো জবাব না দিয়ে, 'আমার মনে হয় কী, দ্বিজেন আরম্ভ করলে, 'বিয়ে ব্যাপারটাকে ধর্ম্মের সঙ্গে জড়িয়ে মানুষ এমন ভুল করেছে—'

মালিনী তাড়াতাড়ি বাধা দিলে: 'এখন থাক্ ও-সব কথা। এখন পর্য্যন্ত তোমার সঙ্গে কোনো কথাই তো বলা হ'লো না। একটু বোসো তুমি—সুলতাকে ডেকে আনি। She's wonderful।'

* * *

সুলতা জিজ্ঞেস করলে, 'কে এই ভদ্রলোক?' মালিনী জবাব দিলে, 'আমার এক বন্ধু।' কিন্তু সুলতা মনে-মনে হাস্‌লো। সুলতা বোঝে—সবি বোঝে। এক যুবতী যখন এক যুবককে বন্ধু বলে' পরিচয়ই দেয়, তখন মনে-মনে সে যে তা'কে কী বলে' গ্রহণ করে, তা কে না বুঝতে পারে! গোড়াতেই সুলতার সন্দেহ হয়েছিলো; এ-কথা ভাবতে পেরে তা'র খুব ভালো লেগেছিলো যে মালিনী মুখে যা-ই বলুক্ আর বাইরে যে-ভাবই দেখাক্—আসলে সে-ও তা'রি মত, সুলতারই মত, তা'রো মনের অনেক নীচে তোলপাড় করছে 'infinite passion and the pain—'সুলতার বাকিটা মনে পড়লো না। দু'জন যুবক-যুবতীর মধ্যে মধুর সম্পর্ক কল্পনা করতে সুলতা ভালোবাসে; কারণ প্রেম হচ্ছে মানুষের জীবনের সব চেয়ে মহান জিনিষ; প্রেম থেকেই সব আর্টের জন্ম; প্রেমের

মত আর কিছু নেই। যুবক-যুবতীদের মধ্যে প্রেমের সম্পর্কটাই সব চেয়ে স্বাভাবিক—বল্‌তে গেলে, অবশ্যম্ভাবী; তা না হওয়াটাই অন্যায়—এমন কি, কুৎসিত। অনেকে অবিশ্যি এমন ভাণ করে যেন কিছুই কিছু নয়, প্রেম-ট্রেমের কোনো মানে হয় না—যেমন, মালিনী। কিন্তু মালিনীও শেষটায় ধরা পড়ে' গেলো, এ-কথা মনে করে' সুলতার আনন্দের সীমা রইলো না। কদ্দিন আর লুকিয়ে থাকবে? আ স ল মালিনীকে একদিন আস্‌তেই হ'বে বেরিয়ে। দ্বিজেনকে দেখ্‌বার পর থেকেই সুলতা তা'র সঙ্গে মালিনীকে জড়িয়ে মনের সুখে কল্পনা করে' যাচ্ছিলো। এতক্ষণে দ্বিজেনের আর মালিনীর প্রেমের দীর্ঘ ইতিহাস তৈরি হ'য়ে গেছে। একটা নতুন রকমের কৌতূহল নিয়ে সুলতা মালিনীর দিকে তাকালো। জিজ্ঞেস কর্‌লে, 'তোমার বন্ধু? অ্যাদ্দিন তো এঁকে দেখি নি। কল্‌কাতায় যে তোমার কোনো বন্ধু আছে, তা-ও তো তুমি কখনো বলো নি।'

'জান্‌লে তো বল্‌বো। দ্বিজেনের সঙ্গে ঢাকায় থাকতে খুব ঘনিষ্ঠতা ছিলো: আমাকে মোটার-ড্রাইভিং শিখিয়েছিলো—'

'মোটার-ড্রাইভিং! কী অদ্ভুত! এ-ও আবার কেউ কাউকে শেখায় নাকি?—যা-ই হোক্; তারপর?' সুলতা চেষ্টা কর্‌লে, যা'তে তা'র কণ্ঠস্বরে একটুও উৎসাহ প্রকাশ না পায়। কৌশলে মালিনীকে জেরা করে' তা'র নিজের তৈরি ইতিহাসে পাকা রঙ দিয়ে নিচ্ছে। মালিনী এখন আত্ম-বিস্মৃত হ'য়ে পড়েছে; এক্ষুনি হয়-তো তা'র কন্‌ফেশ্যন্স্ শুন্‌তে পাবে, এ-সম্ভাবনাতেও সুলতার হৃদয়ে আনন্দ আর ধর্‌ছিলো না।

'তারপর অনেকদিন কেউ কারো খোঁজ-খবর রাখি নি; বছর পাঁচেক পর আজ্‌কে দেখা—'

'বছর পাঁচেক!' সুলতার তৈরি ইতিহাস রহস্যে ঘোরালো হ'য়ে উঠ্‌লো; 'কেন? তারপর হঠাৎ কী করে'ই বা—'

"অত কথা এখন বল্‌বার সময় নেই। দ্বিজেন একা বসে' আছে। চলো তুমি।'

সুলতার মনে হ'লো, মালিনীর গলার আওয়াজে একটা নতুন সুর এসেছে, যা এর আগে সে কখনো শোনে নি। মালিনীকে দেখাচ্ছেও যেন আগের চেয়ে সুন্দর। যে-জিনিষ 'all a wonder and a wild কী-যেন', তা'র একটুখানি স্পর্শেই—মনে-মনে সুলতা উচ্ছসিত হ'য়ে উঠ্‌লো। সে যখন মালিনীকে গিয়ে বলেছিলো, 'দ্বিজেন দাশগুপ্ত তোমার সঙ্গে দেখা কর্‌তে চান্', তখন থেকেই মালিনী যেন আর-একজন মানুষ হ'য়ে গেছে। 'দ্বিজেন? দ্বিজেন এসেছে?' মালিনীর এই কথায় মনের যে-ঔৎসুক্য প্রকাশ পেয়েছিলো, তা'তেই তা'র চরিত্রের এক সম্পূর্ণ নতুন ও আশ্চর্য্য দিক সুলতার কাছে উদ্‌ঘাটিত হয়েছিলো।

হাতের বইখানা রেখে দিয়ে মালিনী তৎক্ষণাৎ উঠে' গিয়েছিলো। সুলতার মনে আগে ছিলো সন্দেহ, কিন্তু এর পরে আর সন্দেহ রাখ্‌বার জায়গা ছিলো না। ওরা দু'জন যে-সব আলাপ কর্‌ছে, তা-ও যেন সুলতা শুন্‌তে পাচ্ছিলো; তা'র মনের মধ্যে ওদের কথাবার্ত্তা যাচ্ছিলো তৈরি হ'য়ে। ওরা দু'জন এ ওকে নিয়েই তৃপ্ত, সুলতার সেখানে দরকার নেই। দরকার নেই, এটা সুলতার পক্ষে গভীর তৃপ্তির কারণ।

তাই, 'আমাকে আবার কেন?' সুলতা দুষ্ট হেসে বল্লে, 'আমি থাক্‌লে তোমাদের হয়-তো অসুবিধে হ'বে।'

'তুমি না-থাকাতেই অসুবিধে হচ্ছিলো। আমি এতক্ষণ বিয়ে নিয়ে বক্তৃতা কর্‌ছিলাম।'

'বিয়ে!' সুলতার হৃদয়ে আনন্দের সমুদ্র উথ্‌লে উঠ্‌লো। এবার আর সে তা'র গলার আওয়াজ থেকে অসীম উৎসাহ আর কৌতূহল গোপন কর্‌তে পার্‌লে না।—'কী বল্‌লেন তিনি—দ্বিজেনবাবু?'

'দ্বিজেনেরও ও-সব বিষয়ে ইণ্ট্‌রেস্‌ট্‌ আছে। তাই—মানুষের স্বভাবতই **monogamy**র দিকে ঝোঁক কিনা, বিয়ের সঙ্গে ধর্ম্মের যে সত্যি সম্পর্ক নেই এই সব নিয়ে আলোচনা হচ্ছিলো। তুমি থাক্‌লে কিছুতেই তা হ'তে পার্‌তো না; অনেক আগেই শাসন কর্‌তে। সেই জন্যেই তো ডাক্‌তে এলাম। এসো।—দ্বিজেন', মালিনীর হঠাৎ মনে পড়্‌লো, 'ইন্দ্রজিতবাবুর বন্ধু, জানো?

হঠাৎ সুলতার মুখ লাল হ'য়ে উঠ্‌লো। তবু সে এ-কথা ভাব্‌বার সময় পেলো: 'মালিনীটা কী চালাক! আমাকে দিয়ে নিজকে ঢাক্‌তে চায়।'

*　　　*　　　*

'আপনার সঙ্গে,' নমস্কার-বিনিময়ের পর দ্বিজেন বল্‌লে, 'আলাপ হওয়ায় খুব খুসি হ'লাম। ইন্দ্রজিতের কাছে আগেই আপনার কথা শুনেছিলাম।'

'আমিও খুব খুসি হ'লাম।' সুলতা বল্‌লে, 'আশা করি আপনি দয়া করে' মাঝে-মাঝে আস্‌বেন। হয়-তো,' একটু থেমে সুলতা জুড়ে'

দিলে, 'হয় তো আপনাকে বল্‌বার দরকার করে না। কারণ, মালিনী যখন রয়েছে, আপনি আস্‌বেনই।'

কথাটা দ্বিজেনের ওপর কী রকম কাজ কর্‌লে, তা লক্ষ্য কর্‌বার জন্য সুলতা তা'র মুখের দিকে তাকালো। দ্বিজেনও তখন সুলতার দিকে তাকিয়ে ছিলো; দু'জনে চোখাচোখি হ'লো। দ্বিজেনের হাসি-হাসি বাদামি চোখ মুহূর্ত্তের জন্য সুলতার মুখের ওপর পড়ে' রইলো; তারপর চট করে' অন্য দিকে সরে' গেলো। সুলতা তাড়াতাড়ি বল্‌লে, 'অবিশ্যি আমিও যে আপনাকে অনুরোধ না কর্‌ছি, তা নয়।'

'তুমি মাঝে-মাঝে এসো, দ্বিজেন।' মালিনী বল্‌লে, 'মাঝে-মাঝেই বা কেন? রোজই এসো। Why not? তোমার যখন খুসি এসো, যখন খুসি যেয়ো। সুলতার ভারি একা-একা লাগে—তাই বল্‌ছি।'

সুলতা নিজের মনে হাস্‌লো। এম্‌নি করে'ও মানুষ নিজকে ঠকায়? যা চায়, তা হাতের কাছে এলেও লজ্জায়, ভয়ে মুখ ফিরিয়ে থাকে। নিজের সঙ্গে ছলনা করে; নিজকে নিজে কষ্ট দেয়, তবু সাহস করে' গ্রহণ করে না। এই লজ্জা, এই ভয় সুলতা দেবে ভেঙে, ভাণ দেবে উড়িয়ে, ওদের দু'জনকে কাছাকাছি এনে দেবে। এ-জন্য যা-কিছু কর্‌তে হয়, সুলতা সব কর্‌বে।

'তাই বল্‌ছো?' সুলতা সোজা জিজ্ঞেস করে' বস্‌লো, 'তুমি চাও না?'

'বাঃ, আমি চাইবো না কেন? দ্বিজেন আমারি তো বন্ধু।'

আমারি তো বন্ধু! কোনো কারণ না থাক্‌লেও কথাটা সুলতার

মনে খোঁচা দিলে! বন্ধু, মুখের একটা কথা। মেয়ে-পুরুষে বন্ধুতা মানেই প্রেম। শেলি-আর-জেইন্! অথচ—মনে হয়, মালিনী এ-কথা নিজের কাছেও স্বীকার করতে চায় না। কেন মালিনীর এত সঙ্কোচ? ইন্দ্রজিতের মত সে-ও নিজের কাছ থেকে লুকিয়ে থাকতে চায়। অথচ, বাইরে থেকে দেখ্তে দু'জনে আকাশ-পাতাল তফাৎ। মানুষের মনের ভেতরের কথা স্থলতা আশ্চর্য্যরকম বুঝ্তে পারে।

হঠাৎ স্থলতা জিজ্ঞেস করলে, 'আপনি কবিতা লেখেন, দ্বিজেনবাবু?'

প্রশ্নটা শুনে' দ্বিজেন একটু অপ্রস্তুত হ'য়ে গেলো। মালিনী উঠ্লো হেসে। —'দ্বিজেন কবিতা লিখ্বে।' এ-সম্ভাবনা তা'র কাছে এতই কৌতুকের ঠেক্লো যে মালিনী আরো চেঁচিয়ে হেসে উঠ্লো।

দ্বিজেন বল্লে, 'হঠাৎ এ-কথা জিজ্ঞেস করলেন কেন?'

স্থলতাকে সময় না দিয়ে মালিনী বলে' উঠ্লো, 'ইন্দ্রজিতবাবু কবিতা লেখেন কিনা—'

'তাই আমাকেও লিখ্তে হ'বে?' দ্বিজেনও হেসে উঠ্লো।

স্থলতা একেবারে নিবে' গেলো। তা'র মনে হ'লো, ওরা দু'জনে মিলে' তা'কে লক্ষ্য করে' হাস্ছে। এ-কথায় এত হাস্বারই বা কী আছে? মালিনীটা এক ফাজিল— যখন- তখন হাস্তে পারলেই বাঁচে; ওর সাম্নে কোনো কথা যদি বলা যায়!

'আপনি অবিশ্যি আমাকে অতিরিক্ত সম্মান দেখিয়েছেন; কিন্তু কোনোকালেও আমি কিছু লিখ্তে পারি নে। পারলে,' দ্বিজেন

বল্‌লে, 'এখন অন্তত খুসিই হ'তাম, কারণ আপনি তা'তে খুসি হ'তেন।'

স্বলতা জীইয়ে উঠ্‌তে লাগ্‌লো। মালিনীকে একেবারে অগ্রাহ্য করাই ভালো; ওকে আমলে আন্‌লেই প্রশ্রয় দেয়া হয়। গম্ভীরমুখে সে জিজ্ঞেস কর্‌লে: 'কিছু লিখ্‌তে পারেন না? কোনোদিন লেখেন নি? সত্যি?'

'কিছু লিখ্‌তে পারি নে।' দ্বিজেন জবাব দিলে, 'কোনোদিন লিখি নি। সত্যি।' স্বলতা মাথা নাড়্‌লে। কিছুতেই-যেন তা'র কথাটা বিশ্বাস হচ্ছিলো না। সত্যি বল্‌তে, কথাটা বিশ্বাস কর্‌তে তা'র ইচ্ছে কর্‌ছিলো না। দ্বিজেনও যদি একজন সাহিত্যিক জিনিয়াস হ'তো, কী চমৎকার হ'তো তা হ'লে! স্বলতা একটু হতাশই হ'লো। তবু একেবারে হাল ছেড়ে না দিয়ে সে চেষ্টা কর্‌তে থাক্‌লো: 'আপনার লিখ্‌তে ইচ্ছেও করে নি কোনোদিন?'

'এ-পর্য্যন্ত নয়; কিন্তু এখন আপনার আগ্রহ দেখে ইচ্ছে কর্‌ছে।'

'কর্‌ছে তো?' স্বলতা উচ্ছ্বসিত হ'য়ে উঠ্‌লো, 'আপনি চেষ্টা করুন্; আপনাকে দিয়ে হ'বে। আপনাকে দেখেই মনে হয়, আপনার মধ্যে সে-জিনিষ আছে।' স্বলতার ভেতরটা আগাগোড়া জ্বল্‌জ্বল্ কর্‌তে লাগ্‌লো। একজন ঘুমোনো কবিকে সে জাগিয়ে তুল্‌বে; তা'র কাছ থেকে প্রথম প্রেরণা পেয়ে দ্বিজেন ক্রমে-ক্রমে একেবারে অমরত্বের রাজ্যে গিয়ে পৌঁছবে। 'আপনার মধ্যে কী আছে, তা আপনি জানেন না—'

'আর তুমি জানো—না?' মালিনী ফস্ করে' বলে' বস্‌লো,

'তোমারি বা এত গরজ কেন, বাপু? একজন্ লোক কিছুতেই রাজি হয় না; তুমি তা'কে জোর করে' ধরে' লেখক বানিয়ে ছেড়ে দিতে চাও কেন? এ তোমার কোন্ রকম আব্দার?'

'যাঁকে বল্‌ছি, তিনি কিছু বল্‌ছেন না—তুমি মাঝখান থেকে ওকালতি কর্‌ছো কেন? তোমাকে তো কেউ কিছু বল্‌তে বলে নি,' সুলতা ইচ্ছে করে' হাস্‌লো, 'তুমি চুপ করে' থাকো।'

দ্বিজেন বল্‌লে: 'রাইট্। তুমি চুপ করে থাকো।'

'বেশ।- থাক্‌ছি চুপ করে'। তোমার ভালোর জন্যই বল্‌ছিলাম।'

'নিজে যোগ দিতে না পার্‌লে চুপ করে'ই থাক্‌তে হয়; বাধা দিতে হয় না।' দ্বিজেন বল্‌লে। তারপর সুলতাকে: 'আপনার খুব লিখ্‌তে ইচ্ছে করে?'

'করে আবার না! লেখ্‌বার জন্যে আমি মরে' যেতে পারি। কিন্তু মরে' গেলেও লেখা আস্‌বে না। আচ্ছা, বল্‌তে পারেন', সুলতা খুব অন্তরঙ্গভাবে বল্‌লে, 'কেন এমন হয়? দু'জন লোক একই চিন্তা করে, একই জিনিষ সমান প্রবলতা নিয়ে অনুভব করে, কিন্তু একজন তা প্রকাশ কর্‌তে পারে, আর-একজন পারে না। কেন এমন হয়?'

'আমি কী করে' বলি? এ-প্রশ্ন আমার মনে তো কখনো ওঠে নি। জীবন ভরে' পড়েছি ইক্‌নমিক্স; করি ইন্‌কাম্-ট্যাক্সে চাক্‌রি—'

ও-সব ওজর দু'হাতে সরিয়ে সুলতা বল্‌লে, 'তা'তে কী? কীট্‌স্‌ও তো কেমিস্‌টের দোকানে কাজ কর্‌তেন। আপনার মধ্যে যদি কোনো জিনিষ থাকে, ফুটে' উঠ্‌বেই।'

'যদি থাকে।' দ্বিজেন গম্ভীরভাবে সায় দিলে।

'আমি একটা কথা বলতে পারি কি ?' মালিনী অনুমতি চেয়ে নিলে, 'দ্বিজেন, তুমি কি চা খাবে ?'

'খাবেন বই কি।' সুলতা বল্‌লে, 'এ আবার জিজ্ঞেস করো কেন ?'

'আমি চট্ করে' তৈরি করে' আন্‌ছি।' মালিনী উঠ্‌তে যাচ্ছিলো, সুলতা তাড়াতাড়ি তা'কে বাধা দিয়ে বল্‌লে, 'না—না, আমিই যাচ্ছি ; তুমি বোসো।' সুলতা কোনোদিন নিজে চা তৈরি করে না, কিন্তু হঠাৎ তা'র মনে হ'লো, সে একাই দ্বিজেকে দখল করে' নিচ্ছে ; ভীরু প্রেমকে যথেষ্ট জায়গা দিচ্ছে না। ছি-ছি, কী অন্যায় তা'র !...

'ও মনে করে,' সুলতা ঘর ছেড়ে যাবার পর মালিনী বল্‌লে, 'যে আমরা হচ্ছি লাভার্স্। সেই জন্য আমাদেরকে "সুযোগ" দেবার জন্য ওর নানারকম চেষ্টা। এ-বিষয়ে ওর এত বেশি আগ্রহ যে, পারলে, ওর জন্যেই আমাদের লাভার্স্ হওয়া উচিত।'

'সে এখন আর হ'বে না, মালিনী,' দ্বিজেন বল্‌লে, 'হ'বার হ'লে অনেক আগেই হ'তো। একবার মূড এসেছিলো ; তা আর ফিরে' আস্‌বে না। যদি বা আসে, ঠিক সে-ভাবে আস্‌বে না। তুমি বড় বেশি স্পষ্ট হ'য়ে গেছো ; বড় বেশি শক্ত। একটা atmosphere-এর মধ্যে গলে' মিশে' যেতে তুমি এখন পারবে না ; তোমার মনের শক্ত-শক্ত কোণগুলো বেরিয়ে থাক্‌বেই। আমি চাই অভিভূত হ'তে ; অভিভূত করতে। দু'জনেরি চৈতন্য হারানো দরকার—তা হ'লেই পার্ফেক্ট্ মূড হয়। সমস্ত ইন্দ্রিয় এবং সমস্ত চৈতন্য এক বিরাট unconsciousness-এর অন্ধকারে অস্তিত্ব হারিয়ে ফেল্‌বে—তা'রি নাম orgasm।'

'তা না-ও হ'তে পারে,' মালিনী বল্লে, 'Orgasmকে নিছক শারীরিক ব্যাপার বলে'ও বর্ণনা করা যায় : কামনা যখন সব চেয়ে প্রবল, সেই মুহূর্তে তা'র সব চেয়ে নিবিড় পরিতৃপ্তি।'

'কিন্তু কামনা জিনিষটাই যে নিছক শারীরিক নয়; তা'র পেছনে মন আছেই আছে। ভালোবাসা মনের জিনিয ; তা-ই থেকে শরীরের কামনা।'

'কে বল্লে তোমাকে? কী করে' জানো যে শরীরের কামনাই আগে নয়, তা-ই থেকে ভালোবাসা? আমরা এতকাল জান্তাম যে মনে কষ্ট হয় বলে'ই চোখে জল আসে; সুখ হয় বলে'ই হাসি পায়, কিন্তু আজকাল প্রমাণ করা হয়েছে যে আমাদের চোখে জল আসে বলে'ই মনে দুঃখ হয়, হাসি পায় বলে'ই হয় সুখ। একটা সুখবর প্রথমে কাজ করে মুখের muscleগুলোর ওপর; তারপর সেখান থেকে ব্রেইনে; তবে আমরা সুখটা উপলব্ধি করতে পারি। গোড়ায় সব জিনিষেরই শরীর। যে-সব জিনিষ আমরা মনের ব্যাপার বলে' জানি —যেমন, স্নেহ, ভালোবাসা, ভয়, রাগ—সমস্তই শারীরিক কতগুলো sensation-এর অনুভূতি মাত্র। ইমোশন্ হচ্ছে স্নায়বিক উত্তেজনার মানসিক তর্জমা।...'

সপ্তম পরিচ্ছেদ

'ব্যাপার কী হে ?' ঈশান জিজ্ঞেস করলে, 'তুমিও শেষটায় "bright young things"-এর একজন হ'য়ে উঠলে ?'

'ঠাট্টা করতে পারো বটে।' ইন্দ্রজিত স্বীকার করলে।

'ঠাট্টা করবো কেন ? এতদিনে তুমি যদি lively হ'য়ে ওঠো, তা হ'লে মানতেই হ'বে যে সুলতা দত্ত একটা অসাধ্য-সাধন করলেন।'

বন্ধুর এই কথাটা অপ্রিয় ঠাট্টার মত ইন্দ্রজিতের মনে বাজলো। ঠোঁট বাঁকিয়ে সে বললে, 'এর জন্যে দ্বিজেনই দায়ী। ও-ই যা ব্যবস্থা করবার করেছে। আমার বাড়িতে হচ্ছে—এই যা।'

'যা-ই হোক্—officially, অন্তত, তুমিই তো host। দেখতে এটা ভালোই দেখাবে। An eye for an eye ; a dinner for a dinner।'

ইন্দ্রজিত কিছু বললে না।

'সুলতা দত্ত সম্বন্ধে', ঈশান বলতে লাগলো, 'অ্যাদ্দিনে কিন্তু তোমার মন ঠিক করে' ফেলা উচিত। বেচারাকে কদ্দিন আর purgatoryতে ফেলে' রাখবে ? আরো কিছুদিন এ-ভাবে গেলে তোমার ব্যবহার রীতিমত নিষ্ঠুর হ'য়ে উঠবে।'

'নিষ্ঠুর ! হ'লেই বা কী আসে যায় ? শেলি কি হ্যারিয়েটের প্রতি নিষ্ঠুর হয় নি ?' ইন্দ্রজিত হাসলো ; কিন্তু সে-হাসিতে কোনো আনন্দ ছিলো না। এমন-কিছু ছিলো, যা'র জন্য ঈশান বন্ধুর মুখের দিকে ভালো করে' তাকালে।—'তোমাকে ভালো দেখাচ্ছে না, ইন্দ্রজিত।'

ক্লান্তভাবে চুলের মধ্যে হাতের আঙুলগুলো চালিয়ে দিয়ে ইন্দ্রজিত বললে, 'রোজ এ-কথাটা আমাকে শুনিয়ে কী লাভ ?'

'না ; আজকে যেন বিশেষ খারাপ দেখাচ্ছে। হয়েছে কী ?'

'নতুন কিছু হয় নি।'

'তোমার বিশ্রী লাগছে সব—নয় ? কখন্ আসবে সবাই ?'

'আধ-ঘণ্টার মধ্যেই আশা করা যায়।' ঘড়ির দিকে তাকিয়ে ইন্দ্রজিত বললে, 'তুমি আগে এসে ভালোই করেছো।'

'কেন ?'

'বিশেষ-কিছু নয় ; এম্নি।'

কিন্তু ঈশান বুঝতে পারলে যে কথাটা সত্যি নয়। কিছু-একটা কারণ না থাকলে ইন্দ্রজিত ও-রকম করে' বলে না। একটু পরে ঈশান জিজ্ঞেস করলে : 'নতুন কোনো কবিতা লিখলে ?'

'না—মানে, একটা লিখেছি।'

'কোথায় ? নিয়ে এসো তো দেখি।'

'না—না, এখন থাক্।'

'কখন্ তবে ? একটু পরেই তো সবাই—'

'আচ্ছা, আচ্ছা—' ইন্দ্রজিত সহজেই রাজি হ'য়ে গেলো। শুধু তা-ই নয়, আরো বললে, 'তোমাকে না-দেখানো অবধি আমার কোনো লেখাই পাকা হয় না। আমি কিছুতেই বুঝতে পারি নে, কোন্টা কেমন হ'লো।—'

'সে-সব যাক্। এখন আনো তো কবিতা।'

ঈশানের আগ্রহে ইন্দ্রজিত মনে অনেকটা জোর পেলো। টেবিলের

ওপর ছ'পেনি দামের কাগজের মলাট-ওলা একটা বই পড়ে' ছিলো, তা'র ভেতর থেকে বেরিয়ে এলো এক টুক্‌রো ভাঁজ-করা কাগজ। ঈশান ওটা নেবার জন্যে হাত বাড়ালে, কিন্তু, 'তুমি পড়্‌তে পার্‌বে না—' ইন্দ্রজিত বল্‌লে, 'ঢের কাটাকুটি আছে। আমিই পড়্‌ছি।'

মনে-মনে একবার আগাগোড়া পড়ে' নিয়ে ইন্দ্রজিত ভারি, মোটা গলায় পড়্‌লো :

এখন বিকেল হ'লো। আমাদের জানালার কাছে
জ্বলেছে সোনালি আলো। তা'রি আভা মেঝেতে, দেয়ালে—
বুনিছে রঙের জাল। তা'রি ছোঁয়া রামধনু জ্বালে—
আয়নার কোণ্ থেকে বাঁকা-রেখা খিলানের কাছে :
আলোর অসহ্য চাপে আকাশ মূর্চ্ছিত হ'য়ে আছে ;
পশ্চিমে মেঘের গুহা মুখ মেলে' পৃথিবীতে ঢালে
আলো—আলো—আরো আলো। উজ্জ্বল সোনালি আর লালে
সমস্ত পৃথিবী, দ্যাখো, ভরে' গেছে আনাচে-কানাচে।

চলো জানালার কাছে। রেখে দাও হাতের সেলাই ;—
চোখ যে খারাপ হ'বে—বোকা! তুমি তা-ও কি জানো না ?
ছাই কাজ! এসো তুমি ; মুখোমুখি দাঁড়াবো দু'জন :
দেখিবো তোমার চুলে আকাশের লাল আর সোনা।
ঝরিবে মুহূর্ত্তগুলি ; কারো মুখে কোনো কথা নাই ;
কথা ক'বে দু'জনের হৃদয়ের উদ্দাম স্পন্দন।

পড়া শেষ হ'লে ইন্দ্রজিত অভ্যাস্‌ভাবে কাগজখানা সেই বইয়ের ভেতর ফিরিয়ে রাখ্‌লে। ঈশান কিছু বল্‌লে না। ইন্দ্রজিত ইচ্ছে করে' ঈশানের মুখ এড়িয়ে অন্য দিকে তাকিয়ে রইলো।

খানিক পরে ঈশান বল্‌লে, 'হুঁ।'

দপ্ করে' ইন্দ্রজিত জ্বলে' উঠ্‌লো। তা'র পক্ষে অসাধারণ জোর দিয়ে বল্‌লে : 'আমার তো মনে হয় কবিতাটা বেশ ভালো হয়েছে। বিশেষ করে' সেস্‌টেট্‌টা তো খুবই ভালো।' যেন সে কোনো অদৃশ্য শত্রুর সঙ্গে যুদ্ধ কর্‌ছে, এইভাবে সে দু'হাত দিয়ে হাওয়ায় ঠেলা দিলে। মাঝে-মাঝে তা'র এ-রকম হয়। নিজের কবিত্বশক্তির ওপর তা'র একেবারেই বিশ্বাস নেই ; তাই যখনি সে নিজকে প্রতিষ্ঠা কর্‌বার চেষ্টা করে, সেটা হ'য়ে পড়ে বাড়াবাড়ি। তা'র কথার উগ্রতা তা'র নিজের কানেই অস্বাভাবিক—এমন কি, অসঙ্গত শোনায়। তাই পরের মুহূর্ত্তেই সে যায় একেবারে ঠাণ্ডা হ'য়ে ; তা'র বিনয় মাত্রা ছাড়িয়ে যায়। এখনো তা-ই হ'লো। কারণ, ঈশান যখন তা'র কথার ওপর বল্‌লে, 'তুমি তো জানো, ও-কবিতা আমার ভালো লেগেছে, কেন—' তখন ইন্দ্রজিত মুখে প্রায় লাল হ'য়ে গিয়ে ঈশানকে বাধা দিয়ে তাড়াতাড়ি বলে' উঠ্‌লো, 'তোমার কাছে আমার কোন্ কবিতাই বা ভালো না লাগে ?' কথাটা সে বল্‌তে চেষ্টা কর্‌লো ঠাট্টার স্বরে, ঈশানের সাহিত্য-বিচারের ক্ষমতার ওপর শ্লেষ-হিসেবে ; কিন্তু কিছুতেই সে তা'র মনের আনন্দ গোপন কর্‌তে পার্‌লে না ; তা'র গলার স্বরে ঘণ্টার শব্দের মত তা বেজে উঠ্‌লো। এবং, তা লক্ষ্য করে' ঈশানের মন খুসি হ'লো। অন্যান্য ব্যাপারে ইন্দ্রজিত যতই মৃত আর পীত হোক্—ঈশান ভাব্‌লে —পৃথিবীতে অন্তত একটা জায়গা আছে, যেখানে এসে সে সজীব, যেখানে এসে তা'র হল্‌দে চামড়ার নীচে লাল, মানুষের রক্ত চলাফেরা কর্‌তে আরম্ভ করে ; পাথরের বুদ্ধের মত তা'র মুখ লজ্জা, সুখ, আশা,

হতাশা—এই সব মানুষের আবেগে উজ্জ্বল হ'য়ে ওঠে।' নিজের কবিতা তা'র ক্লান্ত, অসুস্থ জীবনের শেষ উৎসাহ; তা'র জীর্ণ যৌবনের ঔদাস্য একমাত্র নিজের কবিতার ব্যাপারেই থাকে না। এইজন্য ঈশান তা'র সঙ্গে কাব্যচর্চা কর্‌তেই সব চেয়ে ভালোবাসে; সেই সময়েই সে তা'র বন্ধুকে সব চেয়ে ভালোবাসে। কিন্তু এখন সে যা ভাব্‌ছিলো তা মোটেও কবিতা নয়। কিন্তু এক হিসেবে কবিতাও বটে; কারণ, সে ভাব্‌ছিলো, এই কবিতার এক পার্সেণ্ট্‌ও সুলতা দত্ত নয়। সুলতাকে সে জানালার ধারে এসে চুপ করে' দাঁড়িয়ে থাক্‌তে ডাক্‌বে না; সে তা'কে ডাক্‌বে—অন্তত ঈশান তা-ই আশা করেছিলো—জীবনের অদম্য এক তাগিদে, যা শুধু বিকেলের আলো নিয়ে ভাষার কারিকুরি নয়, প্রকৃতির একটা অনুষ্ঠান, যৌবনের একটা যজ্ঞ। ঈশান তা-ই আশা করেছিলো। তা'র ঔপন্যাসিকের সহজ প্রবৃত্তির গুণে সে বুঝেছিলো যে এই ব্যাপারের যা অনিবার্য্য ও একমাত্র পরিণতি—তা যত শীগ্‌গির হ'য়ে যায়, ততই ভালো। ইন্দ্রজিতও হাঁফ ছেড়ে বাঁচে, আর সুলতা—সুলতা-সম্বন্ধে ঈশান যা-কিছু শুনেছে, তা'তে মনে হয়, তা'র পরে আর সুলতার চোখে ইন্দ্রজিতের সঙ্গে শেলির অতটা সাদৃশ্য ধরা পড়্‌বে না; সাহিত্যে তা'র উৎসাহও কমে' যাবে। মেয়েদের পক্ষে দীর্ঘ কৌমার্য্য যতটা অস্বাস্থ্যকর, বছর-বছর বিয়োনোও ততটা নয়। শেষেরটায় শুধু শরীর ভাঙে; কিন্তু প্রথমটায় শরীর আর মন দুই-ই শুকিয়ে যেতে থাকে; এবং, ভাঙ্‌বার চাইতে শুকোনো অনেক খারাপ অবস্থা। তাই, শুকোবার চরম অবস্থায় কেউ হয় ব্লু স্টকিঙ, কেউ বা নার্স্‌; কেউ অনাথ ছেলে—এবং তা না পেলে

বেড়াল—পোষে ; কেউ স্বদেশী করতে বেরোয়, কেউ আর্টের উপাসক হ'তে আরম্ভ করে। কিন্তু পুরুষদের পক্ষে ততটা খারাপ নয় ; কারণ, জীবনকে তা'রা গ্রহণ করে সমগ্রভাবে ; নানা বিষয়ে তা'দের মনটা থাকে ছড়িয়ে ; একদিকে ফাঁকা থাকলেও তা'দের ততটা গায়ে লাগে না —অন্তত, অনেকদিন পর্য্যন্ত লাগে না। এই যেমন ইন্দ্রজিত। ইন্দ্রজিতের কৌমার্য্য যদি আজ পর্য্যন্ত অক্ষত থাকতো, তা হ'লে ওর কোনো খারাপ তো হ'তোই না, বরং ভালো হ'তো, ; কারণ, ওর মন নিস্তেজ, প্রকৃতির দাবী ওর মধ্যে খুব প্রবল নয়। অল্পতেই যা মিটে' যায়, অনেকদিন জমিয়ে রাখলে তা বোধ হয় একটু জোরালো হ'য়ে উঠতে পারতো। কিন্তু ইন্দ্রজিতটা এমন বোকা—! যাক্, যা হয় নি, তা নিয়ে আপশোষ করে' লাভ কী ? একবার একটা অভ্যেস করে' ফেললে আর কোনো উপদেশেই কোনো কাজ হয় না। আশ্চর্য্য, স্বলতার সঙ্গে ইন্দ্রজিত একেবারেই এগোচ্ছে না ; খানিকদূর এসে ঠায় চুপ করে' আছে। অথচ, এ-সব ব্যাপার শেষ পর্য্যন্ত টেনে নিতে ইন্দ্রজিতের একটুও চেষ্টা করতে হয় না ; নিজ থেকেই যেন তা হ'য়ে যায়—অভ্যেসের এম্নি গুণ। মনে হচ্ছে, ইন্দ্রজিতের মনের ওপর স্বলতা নিজকে একেবারেই বসাতে পারে নি ; ইন্দ্রজিত আলগা থেকে-থেকে এখন সরে' পড়ছে। কিন্তু গোড়ায় তো মনে হয়েছিলো ইন্দ্রজিত একটু ঝুঁকে' পড়েছে ; অন্তত, এ-কথা ঠিক যে তা'র অনিচ্ছাসত্ত্বেও—হ'তে পারে, তীব্র প্রতিবাদ সত্ত্বেও—এক অন্ধ, নির্ব্বোধ শক্তি তা'কে টেনে নিয়ে যাচ্ছিলো। হঠাৎ সে ছাড়া পেলো কী করে' ?

'সত্যি করে' বলো, ইন্দ্রজিত', ঈশান জিজ্ঞেস করলে, 'প্রথমটায় স্বলতা কি তোমাকে একটুখানি টানে নি ?'

আগে যে-সব কথা হ'য়ে গেছে, তা'র সঙ্গে এ-কথার যে কিছুমাত্র সম্পর্ক নেই, নিজের চিন্তায় ব্যাপৃত থেকে ঈশানের সে-খেয়াল ছিলো না। কিন্তু ইন্দ্রজিতের কাছে প্রশ্নটা অত্যন্ত আকস্মিক ও অপ্রাসঙ্গিক শোনালে, তাই বিরক্তভাবে সে বললে : 'আবার ! স্বলতা ছাড়া আর-কোনো কথা নেই পৃথিবীতে ?'

এ-কথাতেই যেন ঈশান তা'র প্রশ্নের জবাব পেয়ে গেছে, এইভাবে সে আবার জিজ্ঞেস করলে : 'তা হ'লে হঠাৎ হ'লো কী ? এখন ওকে ছেড়ে দিচ্ছো কেন ?'

হঠাৎ অত্যন্ত নরম হ'য়ে গিয়ে ইন্দ্রজিত নিম্নস্বরে বললে : 'এইবার বিয়ে করবো।'

'বিয়ে করবে ? কা'কে ?'

'কা'কে আবার ? মীরাকে।'

'সত্যি বিয়ে করবে ? কবে ?'

'এই অঘ্রাণেই।'

'এত শীগ্গির ? সব ঠিক করে' ফেলেছো ?'

'নিজের মনে সব ঠিক করে' ফেলেছি। বাকিটা সাত দিনেও ঠিক হ'য়ে যেতে পারে।'

'এত শীগ্গিরই কেন ?'

ইন্দ্রজিত কোনো জবাব দিলে না।

ঈশান আবার জিজ্ঞেস করলে, 'কিন্তু এত শীগ্গির কেন ?'

'কেন আবার ?'

ঈশান নাছোড়বান্দা।—'কেন ?' সে তবু জান্‌তে চাইলে।

হঠাৎ ইন্দ্রজিত একটা অদ্ভুত কথা বল্‌লে: 'আমার শরীর ভারি খারাপ। শীগ্‌গিরই মরে' যাবো।'

'সেইজন্যই,' ঈশান বল্‌লে, 'একজন যুবতী বিধবা রেখে গিয়ে হিন্দু-জীবনের পরিপূর্ণতা ঘটাতে চাও ?'

ইন্দ্রজিত শুষ্কস্বরে আবার বল্‌লে: 'আমার শরীর ভারি খারাপ।'

ইন্দ্রজিতের চোখের দিকে তাকিয়ে ঈশান কথাটার মানে বোঝ্‌বার চেষ্টা কর্‌তে লাগ্‌লো। হঠাৎ ইন্দ্রজিতের কী হ'লো, একসঙ্গে সে অনেকগুলো কথা বলে' ফেল্‌লে: 'সেদিন ডাক্তারের কাছে গিয়েছিলাম। ডাক্তার বল্‌লে—অনেক কথাই বল্‌লে। রক্তে red corpuscle-এর পার্সেণ্টেইজ্‌ আগের চেয়েও কম। আর লিভার—damn the liver! তাই'—লিভারের সঙ্গে বিয়ের কী সম্পর্ক, তা না বুঝিয়েই ইন্দ্রজিত বলে' চল্‌লো, 'আমি ঠিক করেছি, বিয়ে কর্‌বো। শরীরে আর মন-দেয়া-নেয়া সয় না। বিয়ে করে' মীরাকে নিয়ে বিন্ধ্যাচল বা কোথাও গিয়ে কিছুকাল থাক্‌বো। শরীরের বিশ্রাম; মনের শান্তি। আমি চট্‌ করে' মরে যেতে চাই নে, ঈশান।—তা ছাড়া—' ইন্দ্রজিতের স্বর বদ্‌লে গেলো, 'তা ছাড়া, মীরাকে আমি ভালোবাসি।'

'ভালোবাসো ?' ইন্দ্রজিতের মুখ থেকে কথাটা এমন মহান হাস্যাস্পদতা নিয়ে বেরুলো যে ঈশান হাস্‌তেও ভুলে' গেলো।

'অন্তত বিয়ে করার পর—চেনা-পরিচয় হ'লে যে ওকে ভালোবাস্‌বো, তা বুঝ্‌তে পার্‌ছি।'

'কী করে' বুঝ্‌তে পার্‌ছো ?'

'কবিতা লিখ্‌তে বস্‌লেই,' ইন্দ্রজিত প্রায় হিংস্রভাবে জিজ্ঞেস কর্‌লে, 'ওর কথা মনে পড়ে কেন ?'

ঈশান যুক্তির খাতিরে বল্‌লে, 'এ-ই কি আমার প্রশ্নের উত্তর হ'লো ?' কিন্তু মনে-মনে সে জান্‌তো যে ইন্দ্রজিতের মীরাকেই দরকার, মীরাকে বিয়ে করে' সে বাস্তবিক সুখী হ'বে। তাই ঈশান নিজেই আবার বল্‌লে: 'হ'লো বই কি। এক হিসেবে হ'লোই তো। After all, তোমার কবিতা তো তুমিই। তাই তোমার কবিতার সঙ্গে মীরা যখন খাপ খায়, তখন তোমার সঙ্গেও বেখাপ্পা হ'বে না। তা হ'লে করো বিয়ে। আজকে মীরা এখানে থাকলে ভালো হ'তো। ডিনারের পর তোমার ফিয়ঁাশীকে সবার কাছে introduce কর্‌তে পার্‌তে—যেমন দস্তুর।'

'না-হয় মুখেই বলে' দেবো—'

'ও-কাজও কোরো না।' ঈশান গম্ভীর হ'য়ে গেলো, 'সুলতা মর্ম্মাহত হ'বে। ওর কথাও তোমার একটু ভাবা উচিত। অন্তত আজকে নয়; নিজের বাড়িতে নেমন্তন্ন করে' এনে নয়। সেটা এত নিষ্ঠুর হ'বে যে সুলতা মনে কর্‌তে পারে, তুমি তা'র প্রেমে হতাশ হ'য়ে মীরাকে বিয়ে কর্‌ছো।'

'ছাই নিষ্ঠুর হ'বে। কিছু হ'বে না। আমি সুলতার সঙ্গে এমন কোনো ব্যবহার করি নি, যা'তে ও মনে-মনে কোনো আশা রাখ্‌তে পারে।'

'বিয়ের আশা না রাখতে পারে! কিন্তু—'

'কিন্তু কী?' ইন্দ্রজিতের নিষ্প্রাণ মুখ মুহূর্তের জন্য জ্বলে' উঠ্‌লো, 'কিন্তু—কিছুই নয়। সুলতার সঙ্গে আমি ভদ্রতার বাইরে এক পা যাই নি। কিন্তু ও যদি আজগুবি সব জিনিষ কল্পনা করে, ও যদি গায়ে পড়ে' দুঃখ নেয়—সে কা'র দোষ? আমার নয় নিশ্চয়ই।'

কথাটা বলে'ই ইন্দ্রজিত বুঝ্‌লে যে সেটা সম্পূর্ণ সত্য নয়। অন্তত তা'র দিক থেকে হ'লেও সুলতার দিক থেকে সত্য নয়। হঠাৎ সুলতার জন্য তা'র মনে দুঃখ হ'লো। তা'র মনে হ'লো, সুলতার ওপর সে অনেক সময় অবিচার করেছে, তা'কে অন্যায়ভাবে অবহেলা করেছে। সুখী লোকের স্বার্থপর উদারতা নিয়ে সে ভাব্‌লে, আজ্‌কে সুলতার সঙ্গে খুব ভালো ব্যবহার কর্‌বে; সুলতাকে মুগ্ধ করে' দেবে। এ-কথা ভেবে তা'র বিবেক ঠাণ্ডা হ'লো। কিন্তু এ-কথা তা'র একবারো মনে হ'লো না যে মীরাকে বিয়ে কর্‌বে ঠিক করে' সুলতাকে মুগ্ধ করে'-দেয়া, আর সুলতাকে একসঙ্গে করুণা আর বিদ্রূপ করা—যা'র মানে হচ্ছে অপমান করা—একই কথা। মনে হ'বার কথাও নয়; কারণ ইন্দ্রজিত আজ সুখী।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

'আপনি কি', সিতাংশু জিজ্ঞেস করলে, "নারী জাগরণে"র একজন পাণ্ডা ?'

'না রী জা গ রণ ?' মালিনী আস্তে-আস্তে উচ্চারণ করলে, 'সেটা কী জিনিষ ?'

'তা-ও জানেন না ?' সিতাংশু চেয়ারে হেলান দিলে, 'তা হ'লে আপনি জানেন কী ?'

'কিছুই নয়।' বাঁ হাতের এক হতাশ ভঙ্গী করে' মালিনী বললে, 'জ্ঞান-সমুদ্রের তীরে নুড়ি-কুড়োনো—তা-ও এ-জন্মে হ'লো না।'

'শুনুন্ তবে।' সাম্নের দিকে ঝুঁকে' পড়ে' সিতাংশু বল্তে লাগ্লো, "নারী-জাগরণ" হচ্ছে কতগুলো প্রবন্ধ, কতগুলো সভা, কতগুলো সমিতির নাম। তা'র লক্ষণ হচ্ছে যদ্দুর সম্ভব খারাপ পোষাক করা ছোরা-খেলা শেখার ভাণ করা, আর রোজ তন্ন-তন্ন করে' সবগুলো খবরের কাগজ পড়া। এবং এদের স্লোগান হচ্ছে: Liberty, Equality, Maternity।'

'তা-ই নাকি ?' টেবিলের ওপর কনুই আর আঙুলের গাঁটের ওপর থুত্নি রেখে মালিনী বললে, 'এরি নাম নারী-জাগরণ ? আপনার কেন মনে হ'লো আমি এই আন্দোলনের—'

'মনে আমার কিছুই হয় নি ; আগে থেকে জিজ্ঞেস করে' নিলাম মাত্র। জাগরণীরা খুব গম্ভীরপ্রকৃতির লোক কিনা, flippancy

তাঁরা একেবারেই সইতে পারেন না। আর, আমি কিনা একটু ওর-নাম-কী—'

মালিনী হেসে উঠ্‌লো। তারপর হঠাৎ গম্ভীর হ'য়ে বল্‌লে, 'এটা আমি কিছুতেই বুঝ্‌তে পারি নে, যে যা'রা নিজেদেরকে সবল, স্বাধীন বলে' প্রতিপন্ন কর্‌তে চায়, তা'রাই কেন এই অবিশ্রান্ত কান্নাকাটি করে? আর, কা'র কাছেই বা তা করে?'

'আর, মজা কী জানেন? এঁরা যে কী চান্, তা-ই বোঝা যায় না। দেবী বলে' মাথায় তুলে' রাখ্‌লে এঁদের অপমান; অথচ তাঁরা এ-ও আশা করেন যে বাস্-এ কোনো নারীর আবির্ভাব হ'লেই একজন পুরুষ উঠে' গিয়ে তাঁর একার জন্যে একটা খালি বেঞ্চি ছেড়ে দেবে। পুরুষের সমানও হ'বো, আবার মেয়ে বলে' সব সুবিধেও পাবো—এ তো আচ্ছা আব্দার!'

'মেয়েরা জাত-হিসেবে এখনো সাবালক হয় নি কিনা—ঘ্যান্‌ঘানানি স্বভাবটা রয়ে' গেছে। আর—আমাদের দেশে, যেখানে মেয়ে-পুরুষে বেশি মেলামেশা নেই, সেখানে লিবার্টি আর ইকোয়েলিটির কথা উঠ্‌তেই পারে না।—অবিশ্যি ম্যাটানি'টির কথা আলাদা।'

'দেশটা,' সিতাংশু একটু ভেবে বল্‌লে, 'একেবারে sex-ridden। ছেলে-মেয়েরা হয় এ ওর মুখ দ্যাখে না, না হয় প্রেম করে।'

'না-হয় পরস্পরকে ঘৃণা করে। এ-ক্ষেত্রে, অবিশ্যি, প্রেম আর ঘৃণা একই জিনিষ।'

'রাইট্। আপনি চমৎকার বোঝেন তো সব! আপনি মেয়ে

হ'য়েও এত বুদ্ধিমান হ'লেন কী করে'? আপনার সঙ্গে কথা বলে' রীতিমত আরাম পাচ্ছি।'

'স্তুতি কা'কে করছেন? আমাকে, না নিজকে?'

'তর্ক করবেন? তা হ'লে আমি আগে থেকেই হার মানছি। যতক্ষণ মতে মেলে, ততক্ষণই কথা কয়ে' সুখ।'

'তর্ক করলে মাথা খোলে—জানেন?'

'তর্ক করলে, যেটুকু মাথা থাকে, তা-ও নষ্ট হ'য়ে যায়। ও না করাই ভালো। তর্ক করে'-করে'ই তো দ্বিজেনটার এ-অবস্থা হ'লো!'

'কী অবস্থা হয়েছে?'

'এই যে—'

'এই যে, কী?'

'আপনি এত বুদ্ধিমান যে আপনাকে তা বলবার দরকার করে না।'

মালিনী হেসে উঠলো।—'যাক্, খুব ফাঁড়া কাটালেন বটে। আপনাকে প্রশংসা করতে হয়। কিন্তু আপনি অমন না-ভেবে কথা বলেন কেন?'

'সবাই তো তা-ই বলে। আপনি বলেন না?'

'না।'

'বলেন বই কি! নিশ্চয়ই বলেন। না বলে'ই পারেন না। যা'রা ভাবে, তা'রা বক্তৃতা দেয়, কথা বলে না। না-হয় বক্তৃতাও দেয় না, কথাও বলে না, চুপ করে' থাকে। চুপ করে' থাকাই তা'দের উচিত।'

'সব বিষয়েই আপনার মন ঠিক করা আছে, দেখছি।'

'ঠিক করা নেই; তখন-তখন ঠিক হ'য়ে যায়।'

মালিনী কথা না বলে' মুচ্‌কি হাস্‌তে লাগ্‌লো।

একটু পরে সিতাংশু বল্‌লে, 'বলুন্।'

'কী বল্‌বো?'

'যা খুসি—আলাপ চল্‌লেই হ'লো। সবাই কথা বল্‌ছে: আমরা চুপ করে' থাক্‌লে ওরা সেটা লক্ষ্য কর্‌বে।'

সিতাংশু এ-কথা বল্‌তে-বল্‌তেই সুলতা তা'দের কাছে এসে উপস্থিত হ'লো। বল্‌লে: 'ঘরের ভেতর গরম লাগ্‌ছে। কেউ কি…'

*　　　*　　　*

একটু দূরে সুলতা দ্বিজেনকে নিয়ে বসে' ছিলো। দ্বিজেনের সঙ্গে নয়, দ্বিজেনকে নিয়ে; কারণ সুলতা আজ্‌কের মত দ্বিজেনের ভার নিয়েছে। দ্বিজেনের সঙ্গে মালিনীর আজ্‌কেই একটা 'বোঝাপড়া' হ'য়ে যাক্—সুলতার এ-ই ইচ্ছে। ওদের ভীরু প্রেম পাখীর ছানার মত মনের নীড়ে ছট্‌ফট্‌ করে' মর্‌ছে; সুলতা তা'কে সাহস দেবে, দেবে সামর্থ্য; নিজকে সে নিঃসঙ্কোচে প্রকাশ কর্‌বে; সবল পাখা মেলে' আকাশের উচ্চতাকে ভেদ কর্‌বে। উপমাটা সুলতার বেশ পছন্দ হ'লো; সে অবাক হ'য়ে ভাব্‌লে, এটা তা'র নিজের, না, কোথাও পড়েছে? যা-ই হোক্, তা'তে কিছু আসে যায় না; ডায়েরিতে এটা ব্যবহার করা যেতে পারে। হয়-তো ডায়েরি লিখে' সে নিজে না জেনে সাহিত্য তৈরি কর্‌ছে, হয়-তো সে মরে' গেলে…যাক্ গে। মালিনী-দ্বিজেনই এখন তা'র কাছে সমস্যা। মনে হচ্ছে, ওদের পুরোনো আলাপটা ঠিক জায়গায় জোড়া লাগে নি;

এখনো ওদের মধ্যে বরফ রয়ে' গেছে। অথচ, ওদের মনের মধ্যে যে কী হচ্ছে, তা ওদের নিজেদের চাইতেও সুলতা ভালো বোঝে। তাই, দ্বিজেনের সঙ্গে সে আলাপ আরম্ভই করলে এই বলে' : 'আপনাকে দেখে মনে হচ্ছে আপনি কিছু-একটা গোপন করবার চেষ্টা করছেন।'

দ্বিজেন চম্‌কে উঠলো। মুখের ওপর একবার হাত বুলিয়ে সে বল্‌লে, 'আমার চেষ্টা খুব সফল হয় নি, দেখা যাচ্ছে।'

সুলতা লক্ষ্য ক'র্‌লে, দ্বিজেনের কানের নীচে থেকে গলা অবধি লালের ছোপ পড়েছে। তা'র মন বিজয়ের উল্লাসে মাতাল হ'য়ে উঠ্‌লো। কেমন? এইবার কেমন? এইবার দ্বিজেন ঠিক ধরা পড়েছে—আর পালাবার উপায় নেই। অধীর আনন্দে সে বলে' উঠ্‌লো : 'এ-রকম চেষ্টা ব্যর্থ না হয়েই পারে না, না হ'য়েই পারে না। একটা জাপানী কবিতা আছে, জানেন?

"আপনার চেয়ে
যে-প্রেম মহানতরো,
জোনাকীর মত
জ্বলে সে ধরণী-'পর
যতই গোপন করো।"'

'জোনাকীর মত?' দ্বিজেন বল্‌লে, 'জাপানীদের প্রেম কি জোনাকীর মত ঠাণ্ডা?'

'জাপানীদের সবি অদ্ভুত। ওরা নাকি কখনো চুম্বন করে না। ওদের প্রেম বোধ হয় মৃদু, হাল্‌কা, ঠাণ্ডা। শীতের দেশ কিনা—'

'শীতের দেশ তো ইংল্যাণ্ডও—'

দ্বিজেনকে কথা শেষ করতে না দিয়ে সুলতা বল্‌লে, 'কিন্তু আমাদের গরম দেশে প্রেম অনেক ভারি, তা'তে উত্তাপ অনেক বেশি। আমাদের ফুলের গন্ধে, আমাদের আকাশের তারায়, আমাদের হাওয়ায়, সেই উত্তাপ—মন যা'তে অভিভূত হ'য়ে পড়ে। সবখানে ষড়যন্ত্র চলে—'

'এখন আপনি অতি-আধুনিক সাহিত্যের মত কথা বল্‌ছেন।'

হঠাৎ সুলতা একটু অপ্রস্তুত হ'য়ে পড়লো। দ্বিজেন কি তা'কে ঠাট্টা করছে? কিন্তু না, দ্বিজেনের হাসি-হাসি বাদামি চোখ একাগ্র দৃষ্টিতে তা'র মুখে তাকিয়ে আছে; তা'র চোখের হাসির পেছনে আ স ল দ্বিজেনকে সে দেখ্‌তে পেয়েছে—সুলতার তা-ই মনে হ'লো। নিজের আত্মস্থতা ফিরে' পেয়ে সে বল্‌লে: 'আর আপনি এখন মালিনীর মত কথা বল্‌ছেন।'

দ্বিজেন বল্‌লে, 'মালিনীর আর আমার মনের গড়ন অনেকটা এক রকম।'

এইবার সুলতা আক্রমণ করবার মত ফাঁক পেলো। এক লাফে অনেকগুলো সিঁড়ি পার হ'য়ে গভীর ইঙ্গিতের স্বরে সে বল্‌লে: 'তবু কেন মিছিমিছি নিজেও কষ্ট পাচ্ছেন, মালিনীকেও কষ্ট দিচ্ছেন?'

দ্বিজেন চুপ করে' রইলো। সুলতার মনে বদ্ধমূল একটা ধারণা হ'য়ে গেছে—কী করে' তা দূর করা যায়? সেই ধারণা সুলতাকে অন্ধ করে' দিয়েছে;—দ্বিজেনকে সে দেখেও দেখ্‌ছে না, বুঝেও' বুঝ্‌তে পারছে না। তাই সুলতা এত কাছে থেকেও দূরে, দ্বিজেন কিছুতেই এগোতে পারছে না, সুলতাই এগোতে দিচ্ছে না। স্পষ্ট ভাষায় কী

করে' এ-সব কথা বলা যায় ? এ-সব কথা আঁচ কর্‌তে হয়, বুঝে' নিতে হয়। দ্বিজেন আশা করেছিলো, স্থলতা চট্ করে' বুঝে' ফেল্‌বে। বুঝে' ফেল্‌তোও, যদি না মালিনীকে সে মনে-মনে তৈরি করে' মাঝখানে দাঁড় করাতো। সাহিত্য থেকে হাতে-কলমে জীবনের পাঠ নিতে গেলে এই রকমই হয়। সাহিত্যকে জীবনে প্রয়োগ কর্‌লে হয় কী, জীবনের অত্যন্ত বাস্তব, মোটা, সহজ জিনিষগুলো আর চোখে পড়ে না; ধার-করা কল্পনার প্রকাণ্ড ছায়ায় সব ঢাকা পড়ে' যায়। যেমন স্থলতার হয়েছে। যা সত্যি-সত্যি হচ্ছে, তা'র চাইতে, যা হ'লে তা'র ভালো লাগ্‌তো, সেটাই তা'র কাছে বেশি সত্যি। দ্বিজেনের মালিনীর কথা মনে পড়্‌লো: 'স্থলতার গরজ দেখে কষ্ট হয়; অন্তত ওরি জন্যে আমাদের লাভার্স্ হওয়া উচিত ছিলো।' মালিনী ঠাট্টা কর্‌তে পারে বটে; কিন্তু দ্বিজেন—দ্বিজেনের আর সে-ঠাট্টায় যোগ দেবার অবস্থা নেই।

স্থলতার একখানা হাত টেবিলের ওপর পড়ে' ছিলো; দ্বিজেন হঠাৎ সাম্‌নের দিকে ঝুঁকে' সেই হাতের ওপর হাত রেখে বল্‌লে, 'দেখি আপনার আঙ্‌টিটা।'

তারপর স্থলতাকে কোনো কথা বল্‌তে না দিয়ে হাতখানা চোখের সাম্‌নে তুলে' ভালো করে' আঙটিটা দেখ্‌তে লাগ্‌লো। স্থলতা আরম্ভ কর্‌লে: 'পাথরটা মোটেও দামী নয়। ওটা—'

একবার চারদিকে তাকিয়ে দ্বিজেন স্থলতার আঙলগুলো তা'র ঠোঁটের ওপর চেপে ধর্‌লে। তা'র ঠোঁটের নরম মাংস থেকে স্থলতার সমস্ত শরীরে এক অদ্ভুত উত্তাপ ছড়িয়ে পড়্‌লো। তাড়াতাড়ি হাত ছাড়িয়ে নিয়ে স্থলতা দ্বিজেনের চোখে তাকালে। দ্বিজেনও চোখ

নাবিয়ে নিলে না। তা'র বাদামি চোখে হাসির আভা আর নেই; তা'র কঠিন দৃষ্টির সাম্‌নে স্থলতার চোখের পাতা নেবে এলো।

স্থলতা সাম্‌নের দিকে তাকিয়ে দেখ্‌লে, একটু দূরে মালিনী আর সিতাংশু চুপ করে' বসে' আছে। সিতাংশুর সঙ্গে মালিনী ছট্‌ফট্‌ কর্‌ছে নিশ্চয়ই। দ্বিজেন মালিনীর; মালিনী দ্বিজেনের। স্থলতার কোনো অধিকার নেই দ্বিজেনকে কেড়ে নেবার, দ্বিজেনের কোনো অধিকার নেই মালিনীকে বঞ্চিত কর্‌বার। তা ছাড়া—ইন্দ্রজিত আছে, কবি-প্রতিভা ইন্দ্রজিত সেন, যা'র জন্যে স্থলতা; যা'কে সে আশ্রয় দেবে, উৎসাহ দেবে; যা'কে সে গৌরব থেকে গৌরবে ঠেলে' নিয়ে যাবে। কিন্তু একজনের কবিতার প্রেরণা হ'য়ে আর একজনের 'সাধারণ' প্রেমিকা হওয়া সম্ভব—এ-দু'য়ে কোনো বিরোধ নেই। দ্বিজে-নের ঠোঁটের উত্তাপ মনে করে' স্থলতার শরীর কেঁপে উঠ্‌লো। ইন্দ্র-জিত যদি এতদিনের মধ্যে একবার তা'র হাতের ওপর হাতও রাখ্‌তো, তা হ'লে আজ সে দ্বিজেনকে স্বচ্ছন্দে অবজ্ঞা কর্‌তে পার্‌তো। দ্বিজেনকে অবিশ্যি দোষ দেয়া যায় না, কিন্তু—কিন্তু মালিনী স্থলতার বন্ধু, মালি-নীর প্রতি তা'র কর্ত্তব্য আছে—সে-কর্ত্তব্যের ব্যাঘাত স্থলতা কিছুতেই হ'তে দেবে না। স্থলতা বন্ধুর জন্য আত্ম-ত্যাগ্‌ কর্‌বে, দ্বিজেনকে বাধ্য কর্‌বে মালিনীকে গ্রহণ কর্‌তে। আত্ম-ত্যাগের মহিমায় স্থলতার বুকের ভেতরটা জ্বল্‌জ্বল্‌ কর্‌তে লাগ্‌লো। সে এক্ষুনি সিতাংশুকে নিয়ে অন্য কোথাও চলে' যাবে; ঘরে দ্বিজেন আর মালিনীকে একা রেখে। স্থলতা তাড়াতাড়ি উঠে' গেলো। দ্বিজেন রইলো অসাড় শরীর নিয়ে পড়ে'।

* * *

'...কেউ কি,' সুলতা জিজ্ঞেস করলে, 'আমার সঙ্গে একটু বারান্দায় গিয়ে বস্‌বে ?'

কথাটা সিতাংশুকে উদ্দেশ্য করে'ই বলা হ'লো ; এবং ভদ্র সমাজের কোনো নিয়ম-অনুসারেই সিতাংশু সুলতার সঙ্গে যেতে অস্বীকার কর্‌তে পার্‌তো না ; কিন্তু সঙ্কট থেকে তা'কে উদ্ধার করলে ইন্দ্রজিত। ইন্দ্রজিত যে কখন্ এসে সুলতার পেছনে দাঁড়িয়েছিলো, কেউ লক্ষ্য করে নি ; হঠাৎ তা'র গলা শুনে' সবাই চম্‌কে উঠ্‌লো : 'চলুন, আমি যাচ্ছি।'

সুলতা মুখ ফিরিয়ে দেখ্‌লে, ইন্দ্রজিত ইতিমধ্যে কাপড়-চোপড় বদ্‌লে এসেছে। ইন্দ্রজিতকে এত সুসজ্জিত সুলতা আর ছাখে নি। তা'র সরু-পাড় ধুতির প্রায় আধ-হাত কোঁচা মেঝেয় লোটাচ্ছে ; হাঁটুর একটু ওপরে এসে থেমেছে শাদা গরদের পাঞ্জাবি ; তা'র ওপর চাদরটা যেন অনেক কষ্টে এলিয়ে আছে—এক্ষুনি পড়ে' যাবে। পাঞ্জাবির গলায় বোতাম লাগানো—মনে হচ্ছে, ঐটুকু চাপেই ইন্দ্রজিতের দীর্ঘ, মেয়েলোকের গলার দম আট্‌কে যাবে। তা'র ওল্টানো চুল জমাট একটা পাতের মত ঝক্‌ঝক্ করছে ; মাঠের মত চওড়া কপালের নীচে তা'র দুই চোখের তীক্ষ্ণ উজ্জ্বলতা। ইলেক্‌ট্রিক আলোর নীচে ইন্দ্রজিতের গায়ের রঙ্ আর জামা-চাদরের রঙ্ এক হ'য়ে মিশে' সুলতার চোখ ধাঁধিয়ে দিলে। হঠাৎ তা'র হৃৎপিণ্ডটা কে যেন লোহার হাত দিয়ে আঁক্‌ড়ে ধরলে ; নিঃশ্বাস ফেল্‌তে তা'র কষ্ট হ'তে লাগ্‌লো।

ইন্দ্রজিত আবার বল্‌লে, 'চলুন, আমি যাচ্ছি।'

স্থলতা কোনো কথা না বলে' আস্তে-আস্তে ইন্দ্রজিতের সঙ্গে বেরিয়ে গেলো। তা'র রক্তের তোলপাড় তা'কে সব ভুলিয়ে দিলে : মালিনীর জন্যে যে তা'র আত্ম-ত্যাগ করবার কথা, তা-ও তা'র একবার মনে হ'লো না। তা'র সমস্ত চেতনা তা'র বাইরে চলে' এসে তা'কে হাল্কা, শূন্য, অস্তিত্বহীন রেখে গেলো; তবু সেই অচৈতন্যের মধ্যে ইন্দ্রজিতকে সে স্পষ্ট করে', শক্ত করে' অনুভব করতে লাগ্‌লো।

সিতাংশু হেসে বল্‌লে: 'ভাগ্যিস ইন্দ্রজিত এসে পড়্‌লো; নইলে তো আমাকেই যেতে হ'তো।'

'আর আমি একা থেকে', মালিনী বললে, 'দ্বিজেনের সঙ্গে তর্ক করতে বাধ্য হ'তাম।'

'দ্বিজেন একা চুপচাপ বসে' আছে কেন? ওর হয়েছে কী?'

'স্থলতার ধাক্কা সাম্‌লে ওঠ্‌বার চেষ্টা করছে বোধ হয়। পুরুষদের মনে স্থলতা একটা ধাক্কা অন্তত দেয়ই। কারণ ও হচ্ছে যাকে বলে **feminine woman**। জানেন তো, মনের দিক থেকে সব লোকই **hermaphrodite**; একেবারে **masculine man** বা একেবারে **feminine woman**—দুই-ই খুব বিরল। যে-মেয়ে যত বেশি মেয়েলি, পুরুষকে সে তত বেশি আকর্ষণ করবে। আপনার তা-ই মনে হয় না?'

'Golly!' সিতাংশু বল্‌লে।

'স্থলতা মেয়েলি মেয়ে,' মালিনী নিজের কথার জের টেনে বলে' যেতে লাগ্‌লো, 'তাই **sex** ওর জীবনের সব চেয়ে প্রধান জিনিষ। যে-"স্বাধীনতা"র জন্য মেয়েদের মারামারি, স্থলতাও তা চেয়েছে—এবং

পেয়েছে ; কিন্তু নিজকে কোনো-না-কোনো পুরুষের সম্পর্কে ছাড়া ও কল্পনা কর্‌তে পারে না, উপলব্ধি কর্‌তে পারে না। ওর নিজের মধ্যে ওর কোনো অস্তিত্ব ও অনুভব করে না ; নিজকে দেখ্‌বার জন্যে, নিজের সম্বন্ধে সচেতন হ'বার জন্যে ওর দরকার একটা আয়না—এবং সে-আয়না হচ্ছে পুরুষ।'

সিতাংশু খেঁকিয়ে উঠ্‌লো, 'Shut up, will you ?'

মালিনী হেসে উঠ্‌লো।—'You *are* impudent.'

'আপনি আমাকে বাগে পেয়ে শেষটায় "intellctual" কথাবার্ত্তা কইতে আরম্ভ কর্‌বেন, তা জান্‌লে আমি গোড়াতেই সাবধান হ'তাম।'

'কী কর্‌তেন সাবধান হ'য়ে ?'

'আমার যা'তে আপনাকে ভালো না লাগে, সে-ব্যবস্থা কর্‌তাম।'

'সে-ব্যবস্থা কি আর চেষ্টা করে' কর্‌তে পার্‌তেন ?'

'ঠিকই বলেছেন ; পার্‌তাম না। আপনার সঙ্গে আমার রুচির খুব মিল আছে। এবং, আমি তো মনে করি, দু'জন লোককে কাছাকাছি আন্‌বার পক্ষে রুচির মিলের মত কিছু নেই।'

'তা'তে pleasure অন্তত বেশি।'

'আর, pleasureই তো সব। না, আপনি মনে করেন, ও জিনিষটা কিছু নয় ?'

'মোটেও তা মনে করি নে। আমার মতে, যখন যা ভালো লাগে, তখন তা-ই করা উচিত।—অবিশ্যি আইন বাঁচিয়ে।'

'আমি শুধু যে তা মনে করি তা নয়, কাজেও করি। রাজার আইন বাঁচিয়ে চলা সোজা—অন্তত, তা'কে ফাঁকি দেয়া সোজা। কিন্তু

যে-সব আইন নিয়ে বাস্তবিক মুস্কিলে পড়্তে হয়, তা হচ্ছে সমাজের আইন, ভদ্রতার আইন, চক্ষুলজ্জার আইন, মুখরক্ষার আইন। সেগুলো বাঁচিয়ে চলাই মুস্কিল।'

'ও-সব জায়গায় একটু কৌশল দরকার। সবাইকে খুসি করার সঙ্গে-সঙ্গে নিজকে খুসি কর্‌তে পারার নামই তো সভ্যতা।'

সিতাংশু কেনো কথা বল্‌লে না।

'হঠাৎ চুপ করে' গেলেন যে?'

সিতাংশু বল্‌লে: 'আপনার শেষের কথটা এত brilliant যে সেটার কোনো মানে হয় কিনা, বোঝ্‌বার চেষ্টা কর্‌ছিলাম।—একটা সিগ্রেট ধরাতে পারি?'

'অনায়াসে। সিগ্রেটের ধোঁয়ার গন্ধ আমার বেশ ভালো লাগে।'

'তা হ'লে নিজেই একটা খেয়ে দেখুন্ না।' সিতাংশু তা'র কেইস খুলে' ধর্‌লে।

'খেয়ে ঢের দেখেছি; কিন্তু নিজে খেলে অত ভালো লাগে না। অন্য-কেউ খেলে তা'র কাছে বসে' থাক্‌তে ইচ্ছে করে। আপনি ধরান্ না।'

সিগ্রেট ধরিয়ে সিতাংশু মালিনীর মুখের ওপর ধোঁয়া ছাড়্‌তে লাগ্‌লো। মালিনী বল্‌লে: 'এ-বাড়িতে এসে বেশ হাওয়া-বদল হ'লো আমার। বাড়িটায় আগাগোড়া পুরুষ-পুরুষ গন্ধ। যে-বাড়িতে কোনো পুরুষ নেই তা'র আবহাওয়া অল্প দিনেই পচে' যায়। আপনি কখনো কোনো মেয়ে-হস্‌টেলের ভেতরে গিয়েছেন?'

সিতাংশু হো-হো করে' হেসে উঠ্‌লো : 'না, সে-সৌভাগ্য এখনো হয় নি।'

'গেলে একটা পচা, মিষ্টি গন্ধ পাবেন, ফুলের তোড়া শুকিয়ে ঝরে' পড়্‌তে থাক্‌লে তা'র গায়ে যে-গন্ধ লেগে থাকে, সেই রকম। প্রথমটায় আপনার ভালো লাগ্‌বে, একটু পরে গা বমি-বমি কর্‌বে। এর চেয়ে বিয়ারের গন্ধ, সিগ্রেটের গন্ধ—এমন কি, বর্ম্মা-চুরুটের গন্ধও অনেক ভালো; অনেক—পরিচ্ছন্ন, if you see whatmean । I'

'Right you are.' সিতাংশু সোৎসাহে বল্‌লে, 'Nothing like a glass of—'

মালিনী সিতাংশুকে শেষ কর্‌তে না দিয়ে নিজের কথা বল্‌লে, 'সেইজন্য মেয়েদের সঙ্গে খুব বেশি মিশ্‌তে আমার ভালো লাগে না। অনেক মেয়ে যেখানে একত্র হয়, সেখানে আমার গা ঘিন্‌ঘিন করে।'

'আমারো তা-ই করে। পুরুষদের সঙ্গ আমার অনেক বেশি পছন্দ হয়। সঙ্গী-হিসেবে মেয়েরা সব অপদার্থ—অন্তত আমি যত মেয়ে দেখেছি, তা'রা সবাই। অবিশ্যি আপনাকে বাদ দিয়ে। আপনাকে প্রথম মেয়ে দেখ্‌লাম, যা'র সঙ্গে আলাপ করা যায়। আপনাকে মেয়ে বলে'ই মনে হচ্ছে না।'

'আর, সত্যিও—আমি খুব বেশি masculine। পুরুষরা সর্ব্বদাই আমার সঙ্গে খুব সহজভাবে মিশ্‌তে পারে; এবং সেই জন্যই স্থূলতা আমাকে দিয়ে সর্ব্বদা নিরাশ হ'য়ে এসেছে। আমাকে দিয়ে প্রেম-ট্রেম হয় না। ওটা আমার line নয়।'

'আমারো ও-জিনিষটা ঠিক আসে না। চুমো-খাওয়ার চাইতে

আমি কথা কইতে ভালোবাসি। অথচ, চুমো'না খেলেও চলে না, এবং সেইজন্যই যে-কোনো মেয়ের কাছে যেতে হয়। চুমো-খাওয়া ছাড়া তা'কে দিয়ে আর-কোনো দরকার নেই বলে' তা'কে ঘৃণা কর্‌তে হয়, আবার, যে-মেয়েকে চুমো খাচ্ছি, তাকেই ঘৃণা কর্‌ছি মনে কর্‌তে নিজের ওপর ঘৃণা আসে।' সিতাংশু ভাষা নিয়ে কুস্তি কর্‌তে-কর্‌তে শ্রান্ত হ'য়ে পড়্‌লো।—'বুঝ্‌তে পার্‌লেন ?'

'ও-রকম হয় কেন, জানেন ? আমাদের দেশের মেয়েরা এখনো ঐ একটা বড় বেশি জিনিষকে প্রাধান্য দিচ্ছে ; ওটা ওদের পক্ষে কর্ত্তব্য, ধর্ম্মের একটা অংশ। বিয়ে না হ'লেও ওরা স্ত্রী ; ওরা কথনো lover হ'তে পারে না। জিনিষটা যে মুহূর্ত্তের, মুহূর্ত্তের উপভোগের, তারপর ভুলে'-যাবার, ওরা তা মনে করা দূরে থাক্‌, শুন্‌লেও শক্‌ড্‌ হ'বে। অথচ তা ছাড়াই বা এ আর কী ? একটা মুডের ব্যাপার। বাকিটা— মানে, বেশির ভাগই হচ্ছে কথা-বলা।'

সিতাংশু কোনো কথা না বলে' মালিনীর ফর্সা, সুন্দর মুখের দিকে, তা'র প্রচুর শরীরের দিকে, তার শাড়ির আঁচলের ভাঁজের দিকে তাকালো। হঠাৎ মালিনী অত্যন্ত সাধারণভাবে জিজ্ঞেস কর্‌লে : 'বাইরে যে-ট্যুসীটারটা দাঁড়িয়ে থাক্‌তে দেখেছি, ওটা আপনার তো ?'

'ঠিক আমার নয়। Pop-এর গাড়ি চুরি করে' নিয়ে এসেছি।...'

* * *

হঠাৎ তা'র সাম্‌নে ঈশানকে দেখ্‌তে পেয়ে দ্বিজেন নিজের ভেতর থেকে উঠে' এলো। বল্‌লে, 'তোমাকে এতক্ষণ দেখি নি যে ? ছিলে কোথায় ?

'ওপরে।' সুলতার পরিত্যক্ত চেয়ারটায় বসে' পড়ে' ঈশান বল্‌লে, 'আজকে এখানে দু'জন অতিরিক্ত পুরুষ আছে। তোমার আপাতত ওপরেই থাকা উচিত ছিলো। এখানে একা বসে' কী কর্‌ছো?'

'একা এখন আছি বটে ; কিন্তু একটু আগেও ছিলাম না। সুলতা ছিলো। আমি সুলতার সঙ্গে প্রেম কর্‌বার চেষ্টা কর্‌ছিলাম।'

'কিন্তু তা'র জন্য তো সুলতার উঠে' যাবার কথা নয়।'

'উঠে' গেছে, ফিরে' আস্‌বে।

'কোথায় গেছে?'

'ইন্দ্রজিতের সঙ্গে বারান্দায়। সুলতার হঠাৎ গরম লাগ্‌তে আরম্ভ কর্‌লো।'

'কেন? তুমি চুমো খেয়েছিলে নাকি?'

'উল্লেখযোগ্য কিছু নয়। শুধু হাতে একবার—'

'সেই জন্যেই বুঝি তুমি নিশ্চিন্ত হ'য়ে আছো যে সুলতা তোমার কাছে ফিরে' আস্‌বেই?'

'কোথায়ই বা যাবে আর?'

'তা-ও তো বটে।—ভালো কথা—ইন্দ্রজিত মীরাকে বিয়ে করা বিষয়ে মন ঠিক করে' ফেলেছে।'

'সে আর নতুন খবর কী? ওর মন তো অনেক দিন ধরে'ই ঠিক আছে।'

'কিন্তু এবার ও উঠে'-পড়ে' লেগেছে—মানে, ওর সাধ্যমত। তোমার কাকীমার কাছে খবরও গেছে বোধ হয়।'

'হঠাৎ এই তাড়া?'

'স্থূলতার হাত থেকে বাঁচ্‌বার জন্য।'

'Silly ass!—ইন্দ্রজিতকে বল্‌ছি, তোমাকে নয়।'

'ইন্দ্রজিতকেই বা তুমি silly ass বল্‌বে কেন?'

'Silly ass নয় তো কী? নইলে কি আর ও স্থূলতাকে appreciate কর্‌তে পারে না!'

'স্থূলতাকে তোমার খুব ভালো লাগে?'

'খুব।'

'কেন?'

'কেন? তা আমি কী করে' বলবো? আমাকে কি "Book of Knowledge" পেয়েছো নাকি?'

"Book of Knowledge"ও সব প্রশ্নের জবাব দিতে পারে না, কৌশলে প্রশ্ন এড়ায় মাত্র। আকাশ কেন নীল? এ-প্রশ্নের উত্তরে সে বোঝায়, আকাশ কী করে' নীল হ'লো। বিজ্ঞান যতই বড়াই করুক্‌, পৃথিবীর কোনো কেনরই তা'র কাছে জবাব মেলে না—not really।'

'তোমার ফিলজফি অন্য সময়ের জন্য তুলে' রাখো। এখন সেন্টিমেণ্ট্‌ল্‌ মুডে আছি। কোনো প্রেমের কবিতা মুখস্থ থাক্‌লে আবৃত্তি কর্‌তে পারো।'

'বাড়ি গিয়ে ইন্দ্রজিতের কবিতার বইটা পোড়ো। এ-পর্য্যন্ত তো পাতাও কাটো নি বোধ হয়?'

'সে তো বাড়ি যখন যাবো, তখন। এখন যে কী কর্‌বো, বুঝ্‌তে পার্‌ছি নে।'

'Oh, don't worry. You'll win her, my lad.'

'মনটা কী রকম লাগছে, বুঝ্‌তে পার্‌ছো না।'

'খুব বুঝ্‌তে পার্‌ছি। ঘুমোতে ইচ্ছে কর্‌ছে? মরে' যেতে ইচ্ছে কর্‌ছে? হাস্‌তে? কাঁদ্‌তে?'

'না—সত্যি!' দ্বিজেন অধৈর্য্যসূচক একটা শব্দ কর্‌লে।

ঈশান হঠাৎ জিজ্ঞেস কর্‌লে: 'তুমি কি একজন জিনিয়াস্?'

'না—অন্তত, আমি যদ্দূর জানি, নয়।'

'সুলতার চোখে?'

'সুলতার চোখে আমি ভীরু প্রেমিক—মালিনীর।'

'ও।' এই মানসিক নাট্যের বাকিটা ঈশান মনে-মনে বুঝে' নিলে। 'দেখ্‌ছো—মালিনী আর সিতাংশু আলাপে একেবারে মশ্‌গুল হ'য়ে আছে। অন্য-কোনো দিকে তাকাচ্ছেও না একবার।'

'মালিনী শুক্‌নো, ঝর্‌ঝরে মেয়ে; সিতাংশুর ওকে পছন্দ হ'বে।'

'তোমার হয় না?'

'গল্প কর্‌বার পক্ষে—খুব; কিন্তু প্রেম কর্‌বার পক্ষে নয়।'

'একটুও নয়?'

'না—অন্তত, এখন নয়। পাঁচ বছর আগে অবিশ্যি ওকে একদিন বিয়ে কর্‌তে চেয়েছিলাম।'

'তারপর?'

'তারপর—ও আর ফিরে' আস্‌বে না, যতই কেন চেষ্টা করি নে আমরা।'

ঈশান চুপ করে' রইলো: দ্বিজেন নিজ থেকেই আবার বল্‌লে, 'প্রথম যেদিন যাই, মালিনীর প্রতি খানিকটা পুরোনো সেণ্টিমেণ্ট

নিয়েই গিয়েছিলাম। কিন্তু দেখ্‌লাম, মালিনী অসম্ভব। ওকে খুব ভালো লাগ্‌লো—কিন্তু—'

'তাই সেই পুরোনো সেন্টিমেণ্ট্‌ প্রয়োগ কর্‌লে সুলতার ওপর ?'

'মালিনী বড় শক্ত, বড় শুক্‌নো ; তুমি ওর সঙ্গে যা-ই করো, প্রতি মুহূর্ত্তে সজাগ হ'য়ে থাক্‌বে, তোমাকেও সজাগ করে' রাখ্‌বে। আমি তা চাই নে ; আমি হারিয়ে যেতে চাই, পালিয়ে যেতে চাই। আমি চাই গলে' যেতে।'

একটু পরে ঈশান বল্‌লে : 'হ্যাঁ ; সুলতার ভেতর তুমি গলে' যেতে পার্‌বে বটে।'…

* * *

একটা ইজি-চেয়ারের ওপর অনেকগুলো কুশান চাপিয়ে ইন্দ্রজিত বল্‌লে : 'বসুন্‌। —আলোটা জ্বালিয়ে দেবো ?'

'থাক্‌ ; অন্ধকারই বেশ লাগ্‌ছে।' সুলতা কষ্টে বল্‌লে।

পর্দ্দার নীচ দিয়ে ঘরের খানিকটা আলো চৌকো হ'য়ে বারান্দায় এসে পড়েছিলো। ইন্দ্রজিত আলো এড়িয়ে সুলতার কাছে একটা চেয়ার টেনে নিয়ে বস্‌লো। খানিকটা কালো আকাশ তারায় ঝক্‌ঝক্‌ কর্‌ছে ; সে-দিকে তাকিয়ে সে খানিকক্ষণ কথা বল্‌তে ভুলে' গেলো।

পাৎলা অন্ধকারে ইন্দ্রজিতের মুখ, গায়ের শাদা গরদ, তা'র বোতাম-আঁটা, নরম, মেয়েলোকের গলা—ইন্দ্রজিতের সমস্ত শরীরের একটা নিবিড় অনুভূতি সুলতাকে আবিষ্ট করে' তুল্‌লো। সুলতার শরীর একটা বিশাল প্রত্যাশায় কাঁপ্‌ছে ; মুহূর্ত্ত থেকে মুহূর্ত্ত—সময়ের অন্তহীন স্রোত তা'কে টেনে নিয়ে যাচ্ছে—যেখানে সেই প্রত্যাশার পরিপূর্ণতা।

কিন্তু ইন্দ্রজিত মুখের কথায় বা শরীরের ভঙ্গীতে কোনো ইঙ্গিতই করলে না। সে ঠিক করে' এসেছিলো, স্বলতাকে আজ মুগ্ধ করে' দেবে; স্বলতার কাছে যদিই বা তা'র কোনো ঋণ থেকে থাকে, তা দেবে শোধ করে'; মীরা যে-ইন্দ্রজিতকে পাবে, অন্য-কোনো মেয়ের কাছে তা'র কোনো বাধকতা নেই। সামাজিকতার অনেক লেফাফাদুরস্ত বুলি তৈরিও ছিলো; তা'র কুঁচোনো ধুতি আর শাদা গরদও স্ব-তার উদ্দেশ্যে কম্প্লিমেণ্ট। কিন্তু বারান্দার স্বচ্ছ অন্ধকারে বসে', তারা-ঝক্‌ঝকে কালো আকাশের দিকে তাকিয়ে তা'র মনের অবস্থা বদ্‌লে গেলো। তা'র মনে হ'তে লাগ্‌লো মানুষের সব কথা বাজে কথা; এক-জন আর-একজনকে যা-কিছু বলে, সব অর্থহীন, না বল্‌লেও চলে। যে-সব কথা বল্‌বার মানে হয়, তা মুখে বলা যায় না, তা বল্‌বার জন্য মানুষকে আবিষ্কার করতে হয়েছে ছন্দ, লিখ্‌তে হয়েছে কবিতা। ইন্দ্রজেতের স্বাভাবিক ক্লান্তি ফিরে' এলো। ইন্দ্রজিত ক্লান্ত, ক্লান্ত। তা'র কিচ্ছু ভালো লাগ্‌ছে না; স্বলতা কেন এখান থেকে উঠে' যায় না? ওরা সবাই চলে' যায় না কেন? চলে' যাওয়া? এখনো খাওয়া হ'তে ঘণ্টাখানেক দেরি, আর খাওয়ার পরও অন্তত দু'ঘণ্টা। ইন্দ্রজিত দীর্ঘ-শ্বাস ফেল্‌লে।...দ্বিজেনটা একটা গাধা—কী দরকার ছিলো ওর ইন্দ্রজিতকে এই শাস্তি দেবার! ঈশ্বর, ঈশ্বর, সে যদি এখন একা থাক্‌তে পার্‌তো, ওপরে তা'র ঘরে গিয়ে যদি শান্তিতে বিশ্রাম করতে পার্‌তো! তা'র মনে হ'তে লাগলো, এখন সে বস্‌লেই একটা কবিতা লিখ্‌তে পারে—অন্তত, খানিকটা যে লিখ্‌তে পারে, সে-বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। না হয় শুয়ে'-শুয়ে' কবিতা পড়্‌তো—ডাকশাঁইটে গ্রেট

কবিতা নয়, মনকে যা বিমূঢ় করে' ফেলে, তা নয়। মন যেখানে আরামে বিচরণ করতে পারে, ঘুমোবার আগে 'যা পড়া যায়—স্টিভন্‌সন্‌ র' হেন্‌লি—না হয় বুক্‌ অব্‌ লাইট্‌ ভার্স্‌, হাজার বার পড়লেও যা ফুরোয় না।...ইন্দ্রজিতের মনে পড়লো, সুলতা সেদিন ঠিক এ-কথাই বলেছিলো, কবিতা কখনো শেষ হয় না; ঠিকই বলেছিলো; ইন্দ্রজিতের নিজেরও তা-ই মনে হয়; তবু সুলতার মুখে ও-কথা শুনে তা'র হাসি পেয়েছিলো। সুলতা, তুমি কেন এ-সব কথা বলতে যাও? এ-সব কথা তোমার মুখে মানায় না।

ইন্দ্রজিত অনুভব করলে, তা'র মধ্যে একটা কবিতা তৈরি হচ্ছে। সুরটা পাওয়া গেছে, কলম হাতে নিলেই কথাগুলো আসে; মীরাকে সে দু' একবার দেখেছে মাত্র—তাও মুহূর্ত্তের জন্য, শুধু চোখে দেখেছে; তবু এই মুহূর্ত্তে সেই মেয়েই তা'র চোখে স্পষ্ট হ'য়ে ফুটে' উঠছে; কালো চুলের প্রকাণ্ড স্তূপ, বড়-বড় চোখের ভীরু, টলটলে দৃষ্টি, ছোট, শাদা কপাল থেকে কয়েক গোছা চুল কিছুতেই সরে' যায় না। দু' একবার দেখেছে বলে'ই মীরা তা'র চোখে এত স্পষ্ট, এত সুন্দর, এত—এত মোহে-ভরা। মীরাকে এর বেশি সে দেখতে চায় নি, চেষ্টা করে নি। তা'র মনের অনেক নীচে মীরাকে সে সর্ব্বদা অনুভব করেছে; দূরবর্ত্তিতার জন্য তা'র মোহ আরো গাঢ় হয়েছে। ইন্দ্রজিতের কবিতার প্রথম লাইন তৈরি হ'য়ে গেলো:

আমার মুখের 'পরে খুলে' দাও কালো চুলগুলি—

ইন্দ্রজিতের মন তাড়াতাড়ি কাজ করতে লাগলো। একটু পরে এলো দ্বিতীয় লাইন:

এলায়িত অন্ধকারে আমাকে আচ্ছন্ন করে' দাও।

ইন্দ্রজিতের ঠোঁট নড়ে' উঠ্‌লো; আস্তে-আস্তে, নিজের মনে-মনে সে উচ্চারণ করলে :

আমার মুখের 'পরে খুলে' দাও—

রুদ্ধস্বরে সুলতা বলে' উঠ্‌লো : 'কী বল্‌ছেন?'

এতক্ষণ সুলতা অনুভব করছিলো, সে এক অনিবার্য্য পরিপূর্ণতার প্রান্তে এসে দাঁড়িয়েছে; এক অনিবার্য্য মুহূর্ত্ত বিপুল বেগে তা'দের দিকে ছুটে' আস্‌ছে; তা'র চলার শব্দ সুলতার হৃৎপিণ্ডে প্রতিধ্বনিত হচ্ছে। স্তব্ধ হ'য়ে সে অপেক্ষা করছিলো; শরীরের প্রত্যেক তন্তু, মনের সমস্ত চেতনা দিয়ে নিবিড়ভাবে অপেক্ষা করছিলো। আজকে একটা-কিছু ঘটবেই, যা আজকে না ঘটলে কোনোকালেই বোধ হয় আর ঘটবে না। ইন্দ্রজিত এক্ষুনি, এক্ষুনি কথা বল্‌বে,—কী বল্‌বে, সুলতা তা জানে; তবু ইন্দ্রজিতের মুখ থেকে সে-কথা সে শুন্‌তে চায়। তাই, অস্পষ্ট কতগুলো মৃদু আওয়াজ শুনে' সুলতা রুদ্ধস্বরে জিজ্ঞেস করলে : 'কী বল্‌ছেন?'

ইন্দ্রজিতের মাথায় একটা হাতুড়ির বাড়ি পড়্‌লো। তা'র কবিতা তৈরি হ'য়ে আস্‌ছিলো; মাঝখান থেকে—এ কী আপদ! সাজানো কথাগুলো ছিট্‌কে ছড়িয়ে হারিয়ে গেলো—আবার তা'দেরকে খুঁজে এনে সাজাতে—যদি বা ইন্দ্রজিত পারে, ঠিক সেই জিনিষ হ'বে না। কিছুতেই নয়; আর, একবার বাধা পেলে মনকে সে-অবস্থায় ফিরিয়ে-নেয়া অসম্ভব হয়। ঠোঁট কাম্‌ড়ে সে বল্‌লে, 'কিছু নয়।'

'বলুন্ না।' সুলতা জোর করলে।

ইন্দ্রজিত স্থলতায় গায়ে থুতু ছিটোতে না পেরে বললে, 'আমি শীগ্‌গিরই বিয়ে করছি—জানেন?'

হঠাৎ স্থলতা ঘুম থেকে জেগে উঠলো। চারদিকে অনেক জিনিষ তা'র নজরে পড়লো। রাস্তার একটা ট্যাক্সির হর্ন্‌, ঘরের ভেতর থেকে হাসির শব্দ, রাস্তার আলো, ঘরের আলো, তা'র মাথার নীচে নরম কুশান—সব সে দেখলে, শুনলে, অনুভব করলে। মুহূর্ত্তের মধ্যে নিজকে এই নতুন অবস্থার সঙ্গে সে মানিয়ে নিলে। হাল্‌কা স্বরে জিজ্ঞেস করলে, 'সত্যি? কাকে?'

'মীরাকে।'

'মীরা কে?'

'কে? কী বল্‌বো? হ্যাঁ—ওর একটা পরিচয় আপনি চিনবেন। ও দ্বিজেনের খুড়তুতো বোন।'

দ্বিজেনের নাম শোনামাত্র স্থলতা হঠাৎ তা'র হাতের ওপর ঠোঁটের নরম মাংসের তীক্ষ্ণ উষ্ণতা অনুভব করলে; তা'র সমস্ত মুখ ঝাঁ-ঝাঁ করতে লাগলো: তবু, চেষ্টা করে' সে বললে: 'তাই নাকি? এতক্ষণ বলেন নি কেন?'

নবম্ পরিচ্ছেদ

খাওয়ার পর সিতাংশু বল্‌লে : 'খানিকক্ষণ ব্রিজ হোক্—কী বলো সবাই ?'

ঈশান বল্‌লে, 'নিশ্চয়ই। কিন্তু হারটা একটু কম করে' ধোরো।'

সুলতা পৃথিবীতে অনেক জিনিষই অপছন্দ করে, কিন্তু তাস-খেলার মত আর-কিছুই নয়। তাস খেল্‌তে—বলাই বাহুল্য—সে জানে না; কোনোরকম খেলাই নয়—এবং জানে না বলে' সে দুঃখিতও নয়। তাস-খেলার মত সময়ের ও এনার্জির অপব্যয় আর নেই, তাস খেল্‌লে মানুষ বোকা হ'য়ে যায়, ভোঁতা হ'য়ে যায়, মোটা হ'য়ে যায়; তাস-খেলার চেয়ে ঘুমোনো ভালো, ঘুম না এলে চুপচাপ শুয়ে' থাকাও ভালো। সুলতার সাম্‌নে কেউ তাস খেল্‌বার কথা বল্‌লেও সে তা সইতে পারে না; তাই সে তীব্রস্বরে বলে' উঠ্‌লো: 'না—না, তাস-টাস হ'বে না। কী বিশ্রী—'

মালিনী তা'কে বাধা দিলে: 'তুমি খেলা জানো না বলে'ই যে আর-কেউও খেল্‌বে না, তা তুমি কী করে' আশা কর্‌তে পারো? তোমার ভালো না লাগে ও-ঘরে গিয়ে গ্রামোফোন চালাও।'

ইন্দ্রজিত তাড়াতাড়ি গৃহস্বামীর কর্ত্তব্য কর্‌লে: 'ওরা খেলুক্ না: আমি আছি আপনার সঙ্গে।'

'সে কী!' ঈশান বল্‌লে, 'তুমি না থাক্‌লে খেলা হ'বে কী করে'? আমার সঙ্গে বস্‌বে কে?'

'দ্বিজেনকে নিয়ে,' সিতাংশু বল্‌লে, 'খেলা হ'তে পারে না। ও ব্রিজ্‌কে ছেলেখেলা মনে করে।'

'অ্যাদ্দিন তো তা-ই ছিলো; আজকাল অবিশ্যি ছেলেমেয়ের খেলা হয়েছে।' ব্রিলিয়েন্ট্‌ একটা-কিছু বলেছে, এই ভাবে দ্বিজেন ঈষৎ হেসে সবার দিকে তাকালো।

মালিনী বল্‌লে: 'আমি খুব ভালো খেলি। সিতাংশুবাবু আমাকে পার্ট্‌নার নিতে পারেন।'

'তোমরা যা খুসি তা-ই করো। আমি বারান্দায় একটু বসি গে।' বলে' সুলতা উদ্ধতভাবে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলো।

চারজনে তাস নিয়ে বসে' গেলো। দ্বিজেন বসে'-বসে' অজস্র সিগ্রেট খেতে-খেতে দু'এক বাজি খেলা দেখ্‌লে। তারপর, 'নাঃ—ভালো লাগ্‌ছে না এ-সব,' বলে' উঠে' চলে' গেলো। ঈশান ছাড়া কেউ তা লক্ষ্যও কর্‌লে না।

বারান্দায় সুলতা নেই। দ্বিজেন বাগানে নেবে গিয়ে দেখ্‌লে—সেখানেও নেই। রাত বাড়্‌বার সঙ্গে একটা রজনীগন্ধা ফুটেছে—কী তীব্র, উগ্র গন্ধ! চোখ বুজে' দ্বিজেন কয়েকটা গভীর নিঃশ্বাস টান্‌লে। বাতাস ঠাণ্ডা;—দ্বিজেন একবার কেঁপে উঠ্‌লো। সুলতা—সুলতা কোথায়? দ্বিজেন আবার বারান্দায় উঠে' এসে একটু অপেক্ষা কর্‌লে—যদিই বা কোনোখান থেকে সুলতা এসে পড়ে। রজনীগন্ধার গন্ধে বাতাস ঝিমিয়ে আস্‌ছে, ঠাণ্ডা বাতাস উষ্ণ হ'য়ে উঠ্‌ছে; দ্বিজেনের নেশা ধরে' গেলো। সে ঘরের ভেতর একবার উঁকি দিলে; তাস-খেলা পুরোদমে চল্‌ছে, সুলতা নেই। দ্বিজেন পাশের ঘরটা দেখ্‌লে: তার-

পর ওপরে চলে' গেলো। ওপরের একটা ঘরে শুধু আলো ; নিশ্চয়ই ইন্দ্রজিতের মা জেগে বসে' আছেন। দ্বিজেন সে-ঘরের দরজার কাছে এসে ইতস্তত করতে লাগ্‌লো। হঠাৎ তা'র মনে হ'লো, সুলতা হয়-তো ছাতে চলে' গেছে। সে-ও যাবে ছাতে ? গিয়ে হয়-তো দেখ্‌বে, সুলতা নেই। এই মুহূর্তে সুলতা হয়-তো নীচের ঘরে বসে' আছে। ইন্দ্রজিতের মা-কে জিজ্ঞেস করবে ? দরজায় ধাক্কা দেবার জন্য হাত তুলে'ও সে নাবিয়ে আন্‌লে। আগে ছাতটা দেখেই আসা যাক্। কিন্তু ছাতটা এমন অসম্ভব জায়গা—সুলতা সেখানে যাবে কেন ? সেখানে যাবার কথা তা'র মাথায়ই বা আস্‌বে কেন ? তবু—। অন্ধকারে পা টিপে'-টিপে' দ্বিজেন সিঁড়ি খুঁজে' পেলো। সাবধানে সিঁড়িগুলো পার হ'য়ে সে হঠাৎ একেবারে খোলা আকাশের নীচে উঠে' এলো।

কার্নিশের ওপর দু'হাতে ভর দিয়ে সুলতা সাম্‌নের দিকে তাকিয়ে ছিলো ; দ্বিজেন এসে তা'র পাশে দাঁড়াতে সে কোনো কথা বল্‌লে না ; শুধু তা'র মুখের দিকে একবার তাকিয়েই চোখ সরিয়ে নিলে। অনেক তারার আলোয় দ্বিজেন এই মেয়েটিকে দেখ্‌লে—তা'র এত কাছে, এত বেশি কাছে। আস্তে জিজ্ঞেস করলে, 'আপনি এখানে যে ?'

দ্বিজেনের দিকে না তাকিয়ে সুলতা বল্‌লে, 'একা-একা ভালো লাগ্‌ছিলো না।'

'আর আমি আপনাকে সারা বাড়িতে খুঁজে' বেড়াচ্ছি।'

চট্ করে' সুলতা মুখ ফিরিয়ে দ্বিজেনের মুখোমুখি হ'য়ে দাঁড়ালো। দ্বিজেন বল্‌লে : 'এ আপনার ভারি অন্যায় কিন্তু। আমি ভেবেছিলাম, আপনি নীচের বারান্দায় থাক্‌বেন।'

'ওপরে এসেছিলাম'—সুলতা ভাঙা-ভাঙা ভাবে বল্‌লে, 'ইন্দ্রজিত-বাবুর মা-র সঙ্গে আলাপ করতে। তারপর—মন এত খারাপ লাগ-ছিলো যে ছাতে এসে—'

'কাঁদ্‌ছিলেন ?'

সুলতা এমন করে' হাস্‌লো যে তা'র মুখ অপূর্ব্ব সুন্দর হ'য়ে উঠ্‌লো।

'কিন্তু মন-খারাপ হ'লো কেন ? ইন্দ্রজিতের মা-র সঙ্গে আলাপ করে' ? না, ওরা তাস খেল্‌ছে বলে' ?'

সুলতা অল্প একটু হাস্‌লো।

'ভাগ্যিস আমার ছাতের কথা মনে হয়েছিলো। নইলে—'

হঠাৎ সুলতা জিজ্ঞেস করলে : 'আপনি এতক্ষণ নীচে কী কর্‌-ছিলেন ?'

এতক্ষণে দ্বিজেনের চোখ খুল্‌লো। সে কী বোকা—সুলতা যে ছাতে পালিয়ে এসে তা'রি জন্যে অপেক্ষা করছিলো, এবং তা'র দেরি-তেই যে তা'র মন-খারাপ—এই অত্যন্ত স্পষ্ট, সহজ কথাটা বুঝ্‌তে তা'র এত সময় নিলো ! সে জিজ্ঞেস করলে, 'বলেন নি কেন যে আপনি ছাতে আছেন ?'

সুলতা দ্বিজেনের চোখে একবার পরিপূর্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে তা'র কাঁধের ওপর একখানা হাত রাখ্‌লে।

খানিকক্ষণ কেউ কোনো কথা বল্‌লে না। তা'দের মাথার ওপর প্রকাণ্ড কালো আকাশ অজস্র তারা ছড়িয়ে দিয়েছে ; এক কোণে অসুস্থ রক্তের মত শহরের আলোর লাল্‌চে আভা। হঠাৎ তা'দের

চোখের ওপর ভাঙাচোরা, লাল একটা চাঁদ বেরিয়ে এলো। একটু-একটু করে' তা'র লাল মুখ হল্‌দে, তারপর শাদা হ'য়ে গেলো। চাঁদ ওপরে উঠে' এলো, কতগুলো তারা গেলো মিলিয়ে, তবু কেউ কোনো কথা বললে না।

তারপর দ্বিজেন তা'র কাঁধ থেকে স্বলতার হাতখানা তুলে' নিয়ে তা'র ওপর চুমো খেলো; এক-এক করে' প্রত্যেকটি আঙলে চুমো খেলো। স্বলতার মুখের ওপর ম্লান জ্যোছনা এসে পড়েছিলো, তা'তে দ্বিজেন দেখলে যে তা'র চোখ বোজা, আর তা'র ঠোঁট একটু-একটু কাঁপছে। বুকের ওপর তা'কে এনে দ্বিজেন তা'র কানের কাছে মুখ নিয়ে বল্‌লে : 'আমি তোমাকে ভালোবাসি।' তারপর এক হাত দিয়ে খুব আস্তে, সযত্নে চুল সরিয়ে তা'র কানের ওপর চুমো খেলো। তারপর তা'র বোজা চোখের পাতার ওপর দু'বার করে' চুমো খেলো।

স্বলতার শরীর রাত্রির আকাশের নীচে একেবারে গলে' গেলো। সে নিজকে নিঃশেষ করে' ছেড়ে দিলে;—দ্বিজেনের প্রত্যেকটি চুম্বন অসহ্য স্বখে তা'র ভেতরে পুড়ে' যেতে লাগ্‌লো। দু'হাত দিয়ে দ্বিজেনের শরীরের সঙ্গে সে নিজকে মিশিয়ে দিলে; তা'র বোজা চোখের নীচে অন্ধকার আলোর মত দপ্‌দপ্‌ করে' জ্বল্‌তে লাগ্‌লো।

দ্বিজেন আবার বল্‌লে, 'তোমাকে ভালোবাসি।' তারপর স্বলতার মুখের ওপর নিজের মুখ চেপে ধর্‌লে; স্বলতার নীচের ঠোঁটের ওপর তা'র দুই ঠোঁট বুজে' গেলো। এম্‌নি ওরা দু'জন;—নিজেদেরকে ওরা ভুলে' গেলো; পরস্পরকে ভুলে' গেলো; চাঁদ আর তারাদের নীচে

হাওয়া হ'য়ে ওরা হারিয়ে গেলো। ওদের পায়ের নীচে মুহূর্তে-মুহূর্তে অসীম সময় গড়িয়ে যেতে লাগ্‌লো।

* * *

রাত বারোটার পর সভা ভাঙ্‌বার কথা উঠ্‌লো।

দ্বিজেন আর ঈশানের বাস্ ধর্‌তে হ'বে; তা'রা সবার আগে বিদায় নিলে। ইন্দ্রজিত স্থলতাকে জিজ্ঞেস কর্‌লে: 'আপনাদের জন্যে একটা ট্যাক্সি আনিয়ে দেবো?'

সিতাংশু বল্‌লে, 'আপনাদের যদি আপত্তি না থাকে, আমার গাড়িটায় পৌছিয়ে দিয়ে আস্‌তে পারি।'

'মিছিমিছি আপনাকে আবার কষ্ট।'

'কষ্ট আমার কিছু নয়। এখান থেকে এখানে—ছু' মিনিটে পৌছিয়ে দেবো। কষ্ট বরং আপনাদেরই। টু-সীটারে একজন-একজন করে যেতে হ'বে। রাজি?'

মালিনী বল্‌লে: 'অনেক ধন্যবাদ।'

স্থলতাও বল্‌লে: 'ধন্যবাদ।'

সিতাংশু বল্‌লে: আপনারা রাজি হলেন বলে' ধন্যবাদ।'

ইন্দ্রজিত বল্‌লে: 'আশা করি এর পর আর কেউ ধন্যবাদ বল্‌বে না।'

'তুমিই বাকি ছিলে,' সিতাংশু বল্‌ল, 'তুমিও বলে' ফেল্‌লে। এর পর তুমি যত খুসি আশা কর্‌তে পারো।'

স্থলতাকে আগে পৌছিয়ে দিয়ে সিতাংশু ফিরে' এলো। মালিনী গাড়িতে উঠে' বল্‌লে: 'আমাকে একটু চালাতে দেবেন?'

'এখন নয়।' বলে' সিতাংশু উঠে' বসলো। 'গুড-নাইট, ইন্দ্রজিত।'

গাড়ি আশুতোষ মুখার্জি রোডে গিয়ে পড়লো।

'একেবারে খালি রাস্তা। স্পীড দেয়া যায় না?'

ভালো করে' স্পীড দিতে-না-দিতেই এলগিন রোড এসে পড়লো। কিন্তু গাড়ি ডান দিকে না ঘুরে' বাঁ করে' সাম্‌নের দিকে ছুটে' গেলো। সিতাংশু একবার ডান হাত বা'র করে' বললে : 'Good-night, Elgin Road.'

গ্যাসের আলোর নীচে খালি চৌরঙ্গী ঝক্‌ঝক্ করছে। মাঝে-মাঝে দু' একটা বাস্ হাওয়ার বেগে উড়ে' আস্‌ছে—যে-কোনো মুহূর্ত্তে টুক্‌রো-টুক্‌রো হ'য়ে ভেঙে পড়্‌লে অবাক্ হ'বার কিছুই নেই। সিতাংশুর ট্যু-সীটারও দারুণ বেগে ছুটে' চলেছে।

পার্ক স্ট্রীট পেরিয়ে মালিনী বললে : 'এইবার স্টীয়ারিং হুইলটা আমার হাতে দিতে পারেন।'

সিতাংশু বললে : 'রাইট্।'

মালিনীর হাতে পড়ে' গাড়ির বেগ যেন আরো বেড়ে গেলো। চওড়া চৌরঙ্গী খাঁ-খাঁ করছে, তা'দের ডান দিকে দোকানের পর দোকান—বন্ধ সব দোকান; বাঁ দিকে ময়দানের অসংখ্য আলো আর মাথার ওপর একটা চাঁদ আর অনেক তারা তা'দের সঙ্গে-সঙ্গে ছুটে' চলেছে।

হোয়াইটওয়েরে মোড়ে আস্‌বার অনেকটা আগেই মালিনী জিজ্ঞেস করলে, 'বাঁ দিকে?'

'যেদিকে খুসি।'

প্রায় সঙ্গে-সঙ্গেই গাড়ি ফুট্‌পাথের একেবারে গা ঘেঁসে বাঁ দিকে মোড় নিলে। মালিনী বললে, 'খুব বেঁচে গিয়েছি।'

'মনের সুখে চালিয়ে যান্। এ-রাস্তায় চেষ্টা করলেও অ্যাক্সিডেন্ট্ কর্‌তে পার্‌বেন না। রাস্তায় যদি বা দু'চারটে লোক থাকে—they'll take care of themselves।'

'এ-সময়ে রোজ খানিকটা প্র্যাক্‌টিস কর্‌লেই তো পারি।'

'প্র্যাক্‌টিস আপনার খুব বেশি না কর্‌লেও চল্‌বে। আস্তে-আস্তে ভিড়ের রাস্তাতেই venture কর্‌তে পারেন। আমি তো আছিই।'

'রোজ-রোজ গাড়ি পাবো কোথায়?'

'মাঝে-মাঝে এটা চুরি করে' আন্‌তে পার্‌বো। না-হয় লেজ্‌লি থেকে একটা ভাড়া আন্‌লেই হ'বে।'

'নিজের একটা গাড়ি না থাক্‌লে সুখ নেই।'

'ঠিকই'; সিংতাশু বললে: 'পৃথিবীতে একটামাত্র অবিমিশ্র সুখ আছে। নিজের গাড়ি নিজে চালানো।'

'এবং দারুণ বেগে চালানো।'

'এবং নিরাপদে চালানো।—সাম্‌নে একটা island আছে—mind।—কোথায় যাচ্ছি আমরা?'

'I haven't the faintest idea.'

'এই যে—সাম্‌নে গার্ডন্‌স্। একটু থামালে মন্দ হয় না।'

'রাইট্।'

আউট্‌রাম ঘাটের সাম্‌নে এসে রাস্তার মাঝখানে গাড়ি থাম্‌লো।

এতক্ষণ প্রবল হাওয়ার মুখে চলে' এসে হঠাৎ তা'দের গরম বোধ হ'তে লাগ্‌লো। কিন্তু একটু পরেই তা'রা টের পেলো যে তা'দের মাথা কন্‌কন্‌ কর্‌ছে, আর নাক দিয়ে অজস্র জল ঝর্‌ছে। সিতাংশু বল্‌লে, 'সময়টা ভারি খারাপ। শহরে সাংঘাতিক ফ্লু হচ্ছে। একটু সাবধান হওয়া ভালো।' বলে' সে গাড়ি থেকে নেবে হুডটা তুলে' দিলে।

মালিনী বল্‌লে, 'এত নীচু হুড—ভারি অদ্ভুত।'

সিতাংশু গাড়িতে ফিরে' এসে সেটাকে রাস্তার এক পাশে সরিয়ে আলো নিবিয়ে দিলে। 'Now for a smoke'. সিগ্রেট মুখে নিয়ে সে দেশলাই জ্বালাতে যাবে, মালিনী বল্‌লে: 'আমাকে একটা offer কর্‌তে পার্‌তেন।'

'Oh, I'm sorry.' সিতাংশুর হাত থেকে কাঠিটা পড়ে' গেলো।—'নিন্ একটা।—ঠিক একটাই আছে আর। You're damned lucky.'

দু'জনে চুপচাপ বসে' সিগ্রেট খেতে লাগ্‌লো। চারদিকে একটি জনপ্রাণী নেই; গঙ্গার দিক থেকে মাঝে-মাঝে জাহাজের শিঙার গম্ভীর স্বর আর আনুসঙ্গিক বিচিত্র সব শব্দ শোনা যাচ্ছে। নদীর হাওয়া ঠাণ্ডা, ভারি ঠাণ্ডা। প্রথমটায় ওরা খুব খুসি হ'লো, কিন্তু একটু পরেই ওদের শীত-শীত কর্‌তে লাগ্‌লো। শীতের ভাবটা ক্রমেই বাড়্‌ছে; অথচ ওদের কারো গায়ে চাদর-টাদর কিছু নেই—না আছে আর-একটা সিগ্রেট। সিতাংশু আর মালিনী গা-ঘেঁষাঘেঁষি করে' বসে' গরম হ'বার চেষ্টা কর্‌লো। গঙ্গার হাওয়ায় আর শরীরের ক্লান্তিতে ওরা আস্তে-আস্তে ঝিমিয়ে আস্‌ছিলো; মালিনীর কাঁধের ওপর মাথা রেখে সিতাংশু

আরামে চোখ বুজ্‌লো। আর আধ মিনিট পরেই সিতাংশু ঘুমিয়ে পড়্‌তো, হঠাৎ মালিনী এত জোরে নড়ে' উঠ্‌লো যে সিতাংশুর মাথাটা সরে' গিয়ে পিঠের গদির সঙ্গে ঠুকে' গেলো।

'God!' মালিনী বলে' উঠ্‌লো, 'একটা বাজ্‌তে চল্‌লো যে! সুলতা বোধ হয় এতক্ষণে থানায় খবর দিয়েছে।'

সিতাংশু বল্‌লে: 'হুঁ; এখন বাড়ি ফেরা যেতে পাটে বটে।'

'আপনার ঘুম পেয়েছে, মনে হচ্ছে। আমিই চালাচ্ছি।' বলে' মালিনী চট্‌পট্‌ স্টার্ট্‌ দিলে।

মালিনী বল্‌লে: 'আপনাকে অনেক ধন্যবাদ।'

সিতাংশু বল্‌লে: 'আমি ভাব্‌ছিলাম, আপনি এক্ষুনি এ-কথাটা বল্‌বেন।'

'আমার তো খুব ভালো লাগ্‌লো এ-সময়টা। আপনার?'

কথা না বলে' সিতাংশু মালিনীর ঘাড়ের ওপর চুমো খেলো।

মালিনী হেসে উঠে' বল্‌লে, 'Don't! অ্যাক্সিডেন্ট্‌ হ'বে কিন্তু।'

'কাঁচকলা হ'বে!' সিতাংশু মালিনীর গালে চুমো খেলো।

মালিনী দীর্ঘশ্বাস ফেলে' বল্‌লে: 'হায় রে, এ-দৃশ্য দেখ্‌বার জন্যে সুলতা নেই।'